সপ্তম শ্রেণির জন্য

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ভারতের সংবিধান

<u>প্রস্তাবনা</u>

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** হিসাবে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে ঃ

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**;

চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**;

মর্যাদা ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে;

এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে;

আমাদের গণপরিষদে, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

<u>THE CONSTITUTION OF INDIA</u>

<u>PREAMBLE</u>

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, econnomic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি উচ্চপ্রাথমিক স্তরে ২০১৩ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষে বলবৎ করতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। সেই সূত্রে সপ্তম শ্রেণির বাংলা বইয়ের সহায়ক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে গৃহীত হবে একটি গোটা কিশোর-উপন্যাস, 'মাকু'। প্রখ্যাত লেখিকা লীলা মজুমদারের এই উপন্যাসে রয়েছে চিত্তাকর্ষক কল্পনার চমকপ্রদ সম্ভার। আশা করা যায়, দ্রুতপঠন বই হিসেবে 'মাকু' শিক্ষার্থীদের সমাদর পাবে। বইটিকে রঙে-রেখায় অসামান্য অবয়ব দিয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পি সমীর সরকার। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদানের জন্য ডাঃ রঞ্জন মজুমদার এবং শ্রী নিমাই গরাই (লালমাটি) কে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি, একটি গোটা বই পড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পঠন-সামর্থ্য যেমন বাড়বে, অন্যদিকে সক্রিয়তা-নির্ভর অনুশীলনীর মাধ্যমে তাদের ভাষা-সাহিত্য বোধও উন্নীত হবে।

এই বইটিও পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধি-র জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

মার্চ, ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

নতুন খেলনাগুলোকে আলমারির মাথায় তুলে দিয়ে আম্মা বলল, ‘তোমাদের বাপি বললে আর আমি কী করতে পারি বলো, কালিয়ার বন থেকে যে আস্ত কেউ ফেরে

না, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কেন, আমার নিজের মামাতো পিশেমশাই গোরু খুঁজতে সেখানে গিয়ে, গোরুতো পেলই না, বরং সাত দিন সারা গা চুলকে সারা, সর্বাঙ্গে এই দাগড়া দাগড়া চাকায় ভরে গেল!'

সোনা বলল, 'ধেৎ! বাপি বলেছে ও আমবাত।' 'তা তোমাদের বাপি আমবাত জামবাত যা খুশি বলতে পারে, এককালে পেয়ারাকে পেয়ালা বলত, তবে পাড়াসুদ্ধ সকলে বলল ওকে চুলবুলিতে ধরেছে। শেষটা সাড়ে তিন টাকা খরচ করে কালিয়া বনের দেউকে পুজো দিয়ে ঠাণ্ডা করে, তবে-না দাগ মিলিয়ে গেল। মোড়ল তো বলেছিল পিসেমশাইয়ের বাঁচার কথাই ছিল না নেহাত কানের কাছ দিয়ে ঘেঁসে

কোনোমতে বেরিয়ে গেছে। এসব কথা যেন আবার মামণির কানে তুলো না।’

পাশের বাড়ির তোতাদের আয়াও সেদিন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, ‘নাহয় মা’র কানে না তুলল, তাই বলে তো আর কথাটা না-ই হয়ে যায় না। কে না জানে আমার ছোটো ভাই পানুয়া ওই বনেই নিখোঁজ হয়ে গেছে আজ পনেরো বছর হলো। মা’র কানে না তুললেও তো আর পানুয়া ফিরে আসবে না!’

এই বলে আয়া আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে মুছে দেখতে দেখতে লাল করে ফেলল। তোতা বললে, ‘আয়াদিদি, তোমার যেমন কথা! বাড়ির মাস্টারমশাই বলেছেন, তোমাদের পানুয়া মোটেই বনে নিখোঁজ

হয়নি। মোড়লের সঙ্গে মারপিট করে, পেয়াদার ভয়ে ফেরারি হয়ে গেছে।’

রাগে আয়ার তুলতুলে গাল দুটো শক্ত হয়ে উঠল, ‘ছিঃ তোতা, মাস্টারমশাইয়ের কাছে আমাদের ঘরের কথা বলতে গেলে কী বলে! মেয়েদের একটু লজ্জা থাকা ভালো।’ আম্মা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, ‘ওরা ওইরকম দিদি, বড্ড অলবড্ডে, ওদের কি অত বুদ্ধি আছে!’

আম্মা বাপির ছোটোবেলাকার ধাইমা, বাপি ওকে আইমা বলে ডাকত। সোনা যখন ছোটো ছিল, আইমা বলতে পারত না, বলত আম্মা; লজেঞ্জুসতে বলত দাদুচ, লেবুকে বলতো দেবু। টিয়া এক বছরের ছোটো, দিদির দেখাদেখি সেও বলে আম্মা।

পুতুল তুলে রেখে আম্মা পা ছড়িয়ে মাটিতে বসে সুপুরি কুচোনোর জাঁতি দিয়ে নারকোল কুচোতে লাগল। তোতাকে নিয়ে আয়া বাড়ি চলে গেলে পর সোনা একটা তিনঠেঙা টুল আনতেই, আম্মা সেটা হাত বাড়িয়ে কেড়ে নিল, 'চালাকি চলবে না, সোনা! ওসব খেলনা পিসির ছেলের জন্য। জন্মদিনে এই এত খেলনা পেলে, ঠেলাগাড়ি, বেবিপুতুল, পেয়ালা-পিরিচ, সত্যিকার চামচ-কাঁটা, তো সেসব সাত দিন না পেরুতে ভেঙে নাশ করে দিলে! খবরদার যদি পিসির ছেলের খেলনাতে হাত দিয়েছ! যাও-না, বাগানে গিয়ে খেলা করো; নোনোর শেকল খোলা, দেখো তো সে পালিয়েছে কি না;

আঃ, যাও-না, এখান থেকে, কাজের সময় গোল কোরো না!'

টিয়া একমুঠো নারকেল কুচো তুলে নিতেই আম্মা আরও রেগে গেল, 'হাঁ-হাঁ-হাঁ, নিয়ো না বলছি, এক কুচি নিয়েছ তো আমি তোমাদের মামণিকে বলে কেমন বকুনিটা খাওয়াই দেখো। এসব তোমাদের জন্য নয়।'

সোনা বলল, 'তাহলে কাদের জন্য? বাপি মামণি মিষ্টি খায় না।'

— 'আরও খাবার লোক আসছে গো, পিসি মিষ্টি খায়, পিসে খায়, ওদের খোকাও খায়। এখন সরো দিকি, নারকোলচিঁড়ে হবে, ইঁচামুড়ো হবে, ক্ষীর ঘন করব।'

সোনা বলল, 'বেশ, ওদের খাওয়াও, আমরা চাই না।' টিয়া বলল, 'আমরা পুঁটলি

নিয়ে কালিয়ার বনে চলে যাচ্ছি। আমার পুঁটলিতে মামণির পুরোনো পাউডারটা নিয়েছি।’

সোনা বলল ‘চুপ, বোকা।’

আম্মার কালো সুতোবাঁধা স্টিল ফ্রেমের চশমা নাকের উপর নেমে এল, সেটাকে তুলে

সে বলল, ‘তাই যাও, কাজের সময় জ্বালিয়ো না, যাও-না দু-টিতে, মজাটা বোঝো গিয়ে।’

সোনা টিয়া হাসতে লাগল। ‘কি ভয় দেখাচ্ছ? বাপি বলেছে বাঘ-ফাঘ নেই জঙ্গলে, সাহেব শিকারিরা কবে মেরে শেষ করে দিয়েছে।’ টিয়া বলল, ‘খালি এই বড়ো বড়ো লাল-নীল-বেগনি প্রজাপতিরা আর কাঠঠোকরা পাখি আছে, তারা ঝুঁটিমাথা নীচের দিক করে গাছের গায়ে গর্ত খোঁড়ে।’

দু-জনে পেছনের বারান্দার জালের দরজা খুলে বাইরে পা দিতে আম্মা চ্যাঁচাতে লাগল, ‘ভালো হবে না বলছি সোনা টিয়া, এমন দুষ্টু মেয়েও তো জন্মে দেখিনি, নিজের পিসির খোকা আসছে বলে হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাক হলো। যেয়ো না বলছি।’

আম্মার চশমাটা এবার সত্যি নাক থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেল। সেটাকে না তুলেই আম্মা চ্যাঁচাতে লাগল,‘বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না, সোনা টিয়া, জঙ্গলে বাঘ না থাকতে পারে বাঘ আর এমন কী, তাকে গুলি করে মেরে ফেলা যায়, কিন্তু কালিয়ার বনের ভয়ংকরের গা থেকে গুলি ঠিকরে পড়ে, এ অনেকের নিজের চোখে দেখা।’

জালের দরজার বাইরের থেকে সোনা টিয়া হি-হি করে হাসতে লাগল।

‘যাও গে, পিসির খোকাকে ওসব গাঁজাখুরি গল্প বলো, আমরা স্কুলে ভরতি হয়েছি, আমরা ভয় পাই না!’ এই বলে সোনা-টিয়া খিড়কি-দোরের খিল খুলে ফেলল। কী করবে আম্মা? বাড়িতে আরেকটা লোকও নেই,

খালি ঠাম্মু দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে, ডাকলে বেদম চটে যাবে, বাপি মামণি পিকনিকে গেছে, ঠাকুর গেছে দোকানে, চাকরদের কারও দেখা নেই। আম্মার পায়ে গুপো, উঠতে বসতে কষ্ট হয়, তাড়াতাড়ি চলতে গেলে হাঁটুতে খিল ধরে, তাই ভাঙা গলায় সমানে সে চ্যাঁচাতে লাগল,'ও সোনা-টিয়া, যেয়ো না বলছি, কালিয়ার বনে আমার ঠাকুরদা হরিণ ধরতে ফাঁদ পেতেছিল, তাতে কী পড়েছিল মনে নেই?'

কে কার কথা শোনে, সোনা-টিয়া, খিড়কি দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে বাইরে থেকে ছিটকানি টেনে আম্মার বেরুনোর পথ বন্ধ করেই এক ছুট।

রাস্তাটা কিন্তু বড্ড ফাঁকা, সরু গলির এ মাথা থেকে ও-মাথা অবধি কেউ নেই, দুপুরের রোদে পায়ের কাছে নিজেদের ছায়াগুলোকে জড়ো করে এনে গাছপালা ঝিমঝিম করছে।

সোনা দেখল টিয়া যেন পিছিয়ে পড়ছে। 'চুপ, পেছন দিকে তাকাতে হয় না।'

টিয়ার হাত ধরে সোনা লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগল।

—'কেন দেখতে হয় না?'

—'তাহলে—তাহলে প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল পায় না।' টিয়া ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল, 'পিসির খোকার নতুন প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল এসেছে, আমাদের নেই!' সোনা তার চোখ মুছিয়ে,

গালে চুমু খেয়ে বলল, ‘কালিয়ার বনে আমরা দুটো প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল কিনব, কেমন?’

গলির পর বড়ো রাস্তা, তারপর গির্জে, তারপর গোরস্থান। গোরস্থানের পর শুনশুনির মাঠ, আগে সেখানে ডাকাত পড়ত, তারপরেই দূর থেকে দেখা যায় ঘন নীল কালিয়ার বন। গোরস্থানের পাশ দিয়ে হনহনিয়ে যেতে হয়। তোতার আয়া বলেছে বিশুদাকে, কারা নাকি সুরে ডেকেছিল, সে ফিরেও তাকায়নি বলে বড়ো বাঁচা বেঁচেছিল!

গোরস্থানের ফটকের কাছে ঝোলাঝালা কোটপেন্টলুন পরা একটা অচেনা লোক, পিঠে একটা ঝুলি। সোনা-টিয়া পাশ কাটাতে যাবে, লোকটা পথ আগলে বলল, ‘আমি

ঘড়িওলা, সারাদিন কিছু খাইনি, পুঁটলিতে কী খাবার আছে, প্লিজ দেবে?’

সোনা টিয়ার বড়ো দুঃখ হলো; সোনা তাকে একমুঠো মুড়ি লজেঞ্জুস আর টিয়া একটা গোলাপি চিনিলাগা বিস্কুট দিল। চেটেপুটে তাই খেয়ে, ঝোলা কাঁধে লোকটা ওদের সঙ্গে চলল। সোনা বলল, ‘তুমি ছেলেধরা নও তো? তাহলে আমার বাপি দোনলা বন্দুক দিয়ে তোমাকে শেষ করবে কিন্তু।’

সে বলল, ‘ আরে ছোঃ, ছোঃ, আমি ঘড়িওলা, ছেলে ধরব কী, আজকাল ছেলে দেখলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। তা কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনতে পারি কি?

টিয়া বলল, ‘আমরা কালিয়ার বনে যাচ্ছি, সেখানে প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল কিনব!’

সোনা বলল, ‘পিসির খোকা আসছে বলে খেলনা হচ্ছে, মিষ্টি তৈরি হচ্ছে, আমাদের আর কেউ চায় না।’

—‘তা কালিয়ার বনে যেতে ভয় করছে না?’

—‘না, আমরা যে স্কুলে ভরতি হয়েছি, ভয় পাই না।’

—‘তাহলে আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে? কালিয়ার বনে আমার মাকু আছে কি না একটু খোঁজ নেবে কি?’

—‘কেন, মাকু দিয়ে কী করবে?’

— ‘ওমা, তার ওপর যে আমার বড়ো মায়া। তার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে যে আমার গেঁটো ধরে গেছে।’ সোনা বলল, ‘মায়া তো পালালে কেন?’ লোকটা অবাক হয়ে গেল।

—‘পাল্লাচ্ছি প্রাণের ভয়ে। কিন্তু মায়া হবে না তো কী। সতেরো বছর ধরে তাকে তৈরি করেছি যে। খেতে খেতে ভেবেছি মাকুর পায়ে ক-টা গাঁট দেব, আর খাওয়া হয়নি। শুয়ে শুয়ে ভেবেছি মাকুর মাথায় পাকানো তারটি কোথায় বসাব, চকমকি পাথরটি কোথায় রাখব, আর ঘুম হয়নি।’

সোনা বলল, ‘ও ঘড়িওলা, মাকু কি তবে একটা ঘড়ি? ঘড়ির ভয়ে কেউ পালায়? ঘড়ি হাঁটতে পারে নাকি?’ লোকটা তাই শুনে হাঁ। ‘ওমা বলে কী, ঘড়ি চলে না! অচল ঘড়ি চালু করাই যে আমার কাজ। তাছাড়া—।’ এই বলে ঘড়িওলা দুঃখ দুঃখ মুখ করে চলল।

টিয়া ওর হাত ধরে বলল, ‘বলো ঘড়িওলা, মাকুর কথা বলো। সে কীরকম ঘড়ি, তাই বলো।’

—‘ঘড়ি সে নয়, যদিও ঘড়ির কল দিয়ে ঠাসা।’

—‘সে কি তবে কলের পুতুল? টিন দিয়ে তৈরি?’

লোকটা রেগে গেল। ‘দেখো, মাকু কথা বলে, গান গায়, নাচে, অঙ্ক কষে, হাতুড়ি পেটে, দড়ির জট খোলে, পেরেক ঠোকে, ইস্ত্রি চালায়, রান্না করে, কাপড় কাচে, সেলাই কল চালায়—’

—‘তবে কি চাকর?’

ঘড়িওলা কাষ্ঠ হেসে বলল, ‘চাকর নয়, বরং মুনিব হতে পারে। সব করতে পারে, শুধু বেশি হাসতে পারে না আর কাঁদতে পারে না। আমার উপর রাগ। দিন-রাত খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে, আমাকে ধরলেই হাসার

কল, কাঁদার কল বসিয়ে নেবে। তাহলেই সে একটা আস্ত ভালো মানুষ হয়ে যাবে, রাজার মেয়ে বিয়ে করবে।'

তাই শুনে সোনা-টিয়া এমনি অবাক হয়ে গেল যে হাত থেকে পুঁটুলি দুটো ধুম করে মাটিতে পড়ে গেল। ঘড়িওলা চমকে গিয়ে বলল, 'পুঁটলিতে ধুম করে কী?'

সোনা বলল, 'ও কিছু না, জ্যামের খালি টিন, কেরোসিনের বোতলের ফোঁদল আর রবারের নল। নিয়ে যাচ্ছি বনে, যদি কাজে লাগে। কোথায় পাবে রাজার মেয়ে?'

ঘড়িওলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'বড়ো সাধ ছিল, নোটো মাস্টারের সার্কাস পার্টিতে মাকু তে-আমাতে খেলা দেখাব, আর

আমাদের দুঃখ থাকবে না। তাই খেলা দেখতে নিয়ে গেছিলাম, সেই আমার কাল হলো।'

—'কেন কাল হলো?'

—'সার্কাসের জাদুকর বাঁশি বাজিয়ে জাদুর রাজকন্যে দেখাল, মাকু বলে ওই রাজকন্যে আমি বিয়ে করব। জাদুকরের কী হাসি, কলের তৈরি খেলনা, কাতুকুতু দিলে হাসে না, দুঃখ হলে কাঁদে না, সে বিয়ে করবে আমার ভেল্কির রাজকন্যে, পরিদের রানিকে! যা ভাগ। সেই ইস্তক মাকু আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, অথচ ওকে তৈরি করতেই আমার সব বিদ্যে ফুরিয়ে গেছে, হাসি-কান্না আমার কম্ম নয়।'

সোনা বললে, 'কতদিন পালিয়ে বেড়াবে? বাড়ি যাবে না? তোমার মা নেই?'

ঘড়িওলা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

—'আছে গো, আছে, সব আছে; বড়ো ভালো সরুচাকলি বানায় আমার মা, একবার খেলে আর ভোলা যায় না। কবে যে আবার তাকে দেখতে পাবো!'

টিয়া বললে,'দুষ্টু মাকু থাকগে পড়ে, তুমি মার কাছে ফিরে যাও।' এই বলে পুঁটলির কোণা দিয়ে টিয়া চোখ মুছল।

ঘড়িওলাও চোখ মুছল। 'তাই কি হয়, দিদি, মাকু যে আমার প্রাণ, ওকে নাগালের বাইরে যেতে দিই কী করে? ওর চাবি ফুরিয়ে গেলেই যে নেতিয়ে পড়বে, তখন চোর ডাকাতে ওর কলকব্জা খুলে নিলেই মাকুর আমার হয়ে গেল।'

—‘কবে চাবি ফুরুবে?’

—‘এক বছরের চাবি দেওয়া, তার সাড়ে এগারো মাস কেটে গেছে, আর পনেরো দিন। বলো, ওকে বের করে চোখে চোখে রাখবে?’

সোনা বললে, ‘সেলাই কল চালায় আর নিজের পেটের চাবিটা ঘুরিয়ে নিতে পারবে না?’

ঘড়িওলা ব্যস্ত হয়ে উঠল। পেটে নয়, দিদি, পেটে নয়, পিটের মধ্যিখানে, গায়ে-বসা এত্তটুকু চাবি, কানখুসকি দিয়ে ঘুরুতে হয়। নইলে মাকু যা দস্যি, কবে টেনে খুলে ফেলে দিত। ওখানে সে হাত পায় না, হাত দুটো ইচ্ছা করে একটু বেঁটে করে দিয়েছি।’

কথা বলতে বলতে কখন তারা শুনশুনির মাঠ পেরিয়ে এসেছে, সামনে দেখে ঘন বন। বনের মধ্যে খানিক রোদ, খানিক ছায়া, পাখির ডাক, পাতার খসখস, বুনো ফুলের আর ধূপ কাঠের গন্ধ। ঘড়িওলা বললে,'আমি আর যাব না, মাকু আমাকে দেখলে ছেঁকে ধরবে, আমার ভয় করে। তোমরা স্কুলে ভর্তি হয়েছ, ভয় পাও না, তোমরা যাও! আমি এখানে গাছের মাথায় পাতার ঘর বেঁধে অপেক্ষা করি।' এই বলে ঘড়িওলা সোনা-টিয়ার ঘাড় ধরে একটু ঠেলে দিল।

দুই

ঠেলা খেয়ে প্রায় একরকম ঢুকেই গেছিল বনের মধ্যে সোনা আর টিয়া, এমন সময়

ঘড়িওলা পেছন থেকে ডেকে বলল, ‘চললে কোথায়? হ্যান্ডবিল নিতে হবে না? তা নইলে মাকুর বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জানবে কী করে? বলি, তাকে চিনতে হবে তো?’

এই বলে ঝোলা থেকে একটা বড়ো মতো গোলাপি কাগজ বের করে, পাশের মাটির ঢিপির ওপরে চড়ে গলা খাঁকরে পড়তে লাগল—

মাত্র পঁচিশ পয়সায়!

অদ্ভুত!

অত্যাশ্চর্য!!

মাকু দি গ্রেট!!!

অভাবনীয় দৃশ্য দেখে যান!

কলের মানুষ চলে ফেরে, কথা কয়, অঙ্ক কষে, টাইপ করে, সেলাইকল চালায়, হাতুড়ি পেটে, রান্না করে, মশলা বাটে, বাসন ধোয়, ঘর মোছে, হারানো জিনিস খুঁজে দেয়, নাচে, গায়, সাইকেল চাপে, দোলনা ঠেলে, পরীক্ষার প্রশ্নের জবাব দেয়!'

এই অবধি পড়ে ঘড়িওলা মাটির ঢিপির ওপরে বসে মাকুর শোকে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। তাই দেখে টিয়া মহাকান্না জুড়ে দিল। সোনা পড়ে গেল মুশকিলে, কাউকে কাঁদতে দেখলেই তার গলায় ব্যথা ব্যথা করে, অথচ তাহলে এদের দু-জনকে থামায় কে? অনেক কষ্টে টিয়ার মুখে মুড়ি লজেঞ্জুস পুরে পুঁটলির গেরো দিয়ে ঘড়িওলার

চোখ মুছে তাদের ঠান্ডা করে, সোনা বলল, ‘কী হয়েছে কী? সবটা পড়তে পারছ না বুঝি?’ ঘড়িওলা মাথা নাড়ল। ‘না, না, বাকিটা লেখাই হয়নি। মাকু যেই পালিয়ে গেল, অধিকারী বলল, আর কালি খরচ করে কী হবে, ওকে আগে ধরে আনা হোক! আমার আর তাই বড়োলোক হওয়া হলো না।’ এই বলে ঘড়িওলা দু-তিন বার ফোঁৎ ফোঁৎ করে নাক টেনে নিল।

সোনা অবাক হয়ে গেল। টিয়াও হ্যান্ডবিল দিয়ে চোখ মুছে বলল,‘কেন পালিয়ে গেল?’

—‘তা পালাবে না? আমি যেই পালালাম, ও আমাকে খুঁজতে না বেরিয়ে ছাড়ে কি! এতটুকু এক কুচি লোহা, কী টিন, কী তামা,

কী পিতল, কী সোনা, কী রূপো যাই থাকুক না কেন, যতই-না লুকোনো জায়গায়, মাকু তাকে ঠিক খুঁজে বের করবে। ওর হাতের পায়ের নখের তলায় একরকম রাডারযন্ত্র লাগিয়ে রেখেছি যে! এখন নিজেই তাই টিনের বোতাম কেটে, হাতঘড়ি ফেলে, ঘড়ি সারাবার যন্ত্রপাতি ছেড়ে, কতগুলো কাপড় আর কাগজ আর কাঠ নিয়ে ফেরারি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটা আলপিন তুলতে সাহস পাচ্ছি না।'

এই বলে চমকে লাফিয়ে উঠল সে, 'নাঃ, এখানে বসে থাকা একটুও নিরাপদ নয়, কখন সে এসে জাপটে ধরে আবার ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করে,—পরিদের রানিকে বিয়ে করব,

কাঁদবার কল দাও, চোখ থেকে জল ফেলো! ভ্যালা গেরো রে বাবা! আর দেখো, সুন্দর লালচে কোঁকড়া চুল, ছাই রঙের চকচকে চোখ আর নাকের ডগায় কালো তিল দিয়ে মাকুকে চিনবে। কিন্তু সাবধান! তিলের নীচে টেপা সুইচ আছে।’

এই বলেই এক ছুটে ঘড়িওলা শুনশুনির মাঠ পার হলো। সোনা গোলাপি হ্যান্ডবিলটা তুলে নিয়ে পুঁটলিতে গুঁজে, টিয়ার হাত ধরে, আস্তে আস্তে বনের মধ্যে ঢুকল। কী ভালো বন, এই বড়ো বড়ো গাছগুলো মাথার ওপর তাদের ডালপালা দিয়ে সবুজ শামিয়ানা বানিয়ে রেখেছে। পাতার ফাঁক দিয়ে এখানে-ওখানে কুচিকুচি রোদ এসে পড়েছে,

গাছগুলোর পায়ের কাছে শুকনো পাতা ঝড়ে পড়ে, দিব্যি সুন্দর গালচে তৈরি হয়েছে। ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়ে কত রঙের ফুল ফুটেছে, একটা মিষ্টি মিষ্টি সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে, চারিদিকটাতে কী ভালো একটা সবুজ আলো ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু সোনা-টিয়াকে ফুল তুলতে দিল না। বলল 'ফুল তুলতে গিয়ে দেরি করলে সন্ধে হয়ে যাবে, নেকড়ে বাঘ বেরুবে।'

টিয়া ফুল না তুলে পট করে একটা সবুজ পাতা ছিঁড়ল। সোনা অমনি পাতাটা কেড়ে নিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, 'চুপ, কিচ্ছু ছুঁবি না, যদি বিষ পাতা হয়?' টিয়া একটা ছোট্ট নুড়ি তুলে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে মারল। অমনি

সোনা দিল এক ধমক, ‘ঢিল খেয়ে যদি কেউটে সাপ ফোঁস করে ফণা তোলে!’

টিয়া আবার ভ্যাঁ করে কাঁদতে যাচ্ছিল, অমনি সোনা তার হাত ধরে দৌড়োতে লাগল— ‘চল, চল, চাবি ফুরোবার আগে মাকুকে খুঁজে বের করতে হবে—না? মাকু কেমন নাচবে গাইবে, আমাদের জন্য গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দেবে।’ দু-জনে দৌড়োতে লাগল।

যতই বনের ভেতর যায়, ততই গাছপালা ঘন হয়ে আসে, আলো কমে যায়। দৌড়োতে দৌড়োতে শেষটা পায়ে ব্যথা ধরে গেল, ফ্রকে রাশি রাশি চোরকাঁটা ফুটল, জল তেষ্টা পেতে লাগল। এমনসময় সোনা-টিয়া দেখল গাছের

নীচে টলটল করে বয়ে চলেছে এতটুকু একটা নদী। কী পরিষ্কার তার জল, তলাকার নুড়ি পাথর কেমন চকচক করছে দেখা যাচ্ছে, কী সুন্দর একটা ছলছল, ঝরঝর শব্দ কানে আসছে। নদীর ধারেই একটা বড়ো কালো পাথরে ঠেস দিয়ে সোনা-টিয়া বসে পড়ল।

ছোট্ট নদী, তাতে একহাঁটু জলও নেই। সোনা-টিয়া পুঁটুলি নামিয়ে আশ মিটিয়ে হাতমুখ ধুলো, পা ডোবালো, আঁজলা আঁজলা জল তুলে খেল, ফ্রক ও ইজের ভিজে একাকার! তারপর খিদে পেয়ে গেল। পুঁটুলি খুলে ঠামুর ঘরের বড়ো পান খেল দুটো দুটো করে। কখন ঘুম পেয়ে গেছে খেয়াল নেই, কালো পাথরের আড়ালে পুঁটুলি মাথায় দিয়ে দুজনার সে কী অসাড়ে ঘুম!

মটমট করে কাদের পায়ের চাপে কাঠকুটো ভাঙার শব্দে তবে ঘুম ভাঙল।

চেয়ে দেখে নদীর ওপারে সরু নালামতো জায়গা বেয়ে জানোয়াররা জল খেতে আসছে। প্রথমে দুটো ঘোড়া, তাদের তাড়িয়ে আনছে টুপিপরা দুটো বাঁদর, তাদের পেছনে গলায় ঘণ্টা বাঁধা একটা ছাগল, তার পেছনে পর পর পর দুটো মোটা মোটা ভাল্লুক, তার পেছনে গোটা ছয় কোঁকড়ালোম ছোটো কুকুর, সবার শেষে রঙচঙে লাঠি হাতে আধখানা লাল আধখানা নীল পোশাক পরা সত্যিকার একটা সং।

নিমেষের মধ্যে জায়গাটা টুংটুং, কিচিমিচি, ঘোঁৎ ঘোঁৎ, ঘেউ ঘেউ শব্দে একেবারে

ভরপুর হয়ে উঠল। অবাক হয়ে সোনা-টিয়া উঠে দাঁড়িয়ে নদীর একেবারে কিনারায় এল। ঠিক সেই সময় চাপা গলায় কে বলল, ‘স্-স্-স্এই, পুঁটুলি ফেলে গেলে পিঁপড়েতে খেয়ে ফেলবে। খাগড়াইগুলো খাসা।’ এই বলে একটা পরিষ্কার রুমাল বের করে লোকটা মুখ মুছে ফেলল।

সোনা-টিয়ার গায়ে কাঁটা দিল। এই তবে মাকু! এ যে মাকু সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কেমন লম্বা সটাং চেহারা, গায়ের মাংসগুলো আঁটোসাঁটো, দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্লাস্টিক আর রাবার দিয়ে তৈরি, মাথায় কোঁকড়া চুল, ছাই রঙের চোখ আর নাকের ডগায় এই মস্ত একটা কালো তিল! ঠিক ঘড়িওয়ালা যেমন বলেছিল! নাঃ, একে আর

ছাড়া নয়, কখন চাবি ফুরিয়ে যাবে তার ঠিক কী, শেষটা দুষ্টুলোক হাত-পা-কল-কব্জা খুলে নিয়ে চলে যাবে, তখন ঘড়িওলা বেচারি আর মাকুর খেলা দেখিয়ে পয়সা করে, বড়োলোক হতে পারবে না।

টিয়া এসব কিছুই নজর করেনি, সে হাঁ করে জানোয়ারদের জল খাওয়া দেখছিল। নদীর কিনারা ধরে তারা সারি সারি মুখ নীচু করে অনেকক্ষণ জল খেল! কী সুন্দর একটা চকর-বকর গবর-গবর শব্দ হতে লাগল।

তখন আলো কমে এসেছে, একটু বাদেই সূর্য ডুবে যাবে। জল খেয়ে মুখ তুলে সং তাদের দেখতে পেল। অমনি দু-হাত দিয়ে মুখের চারদিকে চোঙা বানিয়ে ডেকে বলল, 'আমাদের অধিকারী মশাইকে দেখছ? তোমরা কে?'

মাকু কী একটা বলতে যাচ্ছিল, সোনা তার গা টিপে বলল ‘চুপ, কিছু বোলো না মাকু, চাবি ফুরুলেই তোমার হাত-পা খুলে নিয়ে

যাবে!' ধরা পড়ে দারুণ চমকে গিয়ে, কট করে মাকু মুখটা বন্ধ করে ফেলল। ভেতরে যে কব্জা দেওয়া সেটা বেশ বোঝা গেল।

সোনা নিজেই বলল, 'আমরা সোনা টিয়া, প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল খুঁজতে এসেছি। ও আমাদের বন্ধু। তোমরা কে?'

সং বলল, 'আমরা সার্কাসপার্টির আধখানা। অধিকারী মশাই মাঠের ভাড়া, তাঁবু আর গ্যাসবাতির দাম না দিয়েই পালিয়ে গেছে, তাই আমরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কত বড়ো প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল চাও?'

টিয়া দু-দিকে দু-হাত মেলে দিয়ে বলল, 'এই এত বড়ো। পিসির খোকার পুতুলের চেয়েও ঢের ঢের বড়ো।'

সং বলল, 'তাহলে চলো আমার সঙ্গে।'

সোনা তো অবাক। 'তোমার কাছে আছে?'

'না, কিন্তু চেষ্টা করলে জোগাড় করতে পারি। আমাদের সার্কাসের জাদুকর কী না

করতে পারে! খালি টুপির ভেতর থেকে পাতিহাঁস বের করে, চোখের সামনে ওই ছাগলটাকে হাওয়া করে দেয়, শূন্যে ফাঁস দিয়ে পরিদের রানিকে নাবিয়ে এনে, একসঙ্গে জোড়া ঘোড়ায় চাপায়।'

আড়চোখে একবার মাকুর দিকে তাকিয়ে সোনা বলল, 'চলো, আমরা তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু কী করে নদী পার হব, পাথর যে বড়ো পিছ্‌লা? তুমি এসে আমাদের পার করে দাও-না।'

সং বলল, 'ও বাবা! সে আমি পারব না। তোমরা বেজায় ভারী।'

সোনা বলল, 'না, না, আমরা একটা করে পা শূন্যে ঝুলিয়ে রাখব তাহলে আর ভারী লাগবে না। পুঁটলি দুটো পরে নিয়ে যেয়ো।'

সং কিন্তু কিছুতেই রাজি হলো না। ‘না, শেষটা, যদি আমার নতুন পেন্টেলুনের রং গলে বিতিকিচ্ছি হয়ে যায়। তার চেয়ে তোমাদের বন্ধুই তোমাদের পার করুক-না কেন? বেশ তো পুরুষ্টু আছে দেখতে পাচ্ছি।’

সোনা তাই শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠল, ‘না, না মাকু, জল লেগে যদি তোমার জোড়ার আঠা ধুয়ে যায়, তখন হাত-পা জলে ভেসে যাবে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।’

মাকু একগাল হেসে বলল, ‘কিছু ভয় নেই, হাত-পা আঠা দিয়ে জোড়া হবে কেন? সেরা কারিগরের হাতের কাজ; একসঙ্গে ছাঁচে ঢালাই করা। ওঠো আমার কোলে।’

এই বলে মাকু টপ করে পুঁটলিসুদ্ধ দু-জনকে দু-কোলে তুলে দিব্যি সুন্দর নদী

পার হয়ে গেল। জন্তুরা এতক্ষণ যে-যার চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার তারাও আগের মতো সারি বেঁধে বনের মধ্যে দিয়ে সরু পথ ধরে এগিয়ে চলল।

সবার পেছনে সং, তার পাশে সোনা-টিয়াকে কোলে করে মাকু। এই সময় টুপ করে সূর্যটা বোধ হয় ডুবে গেল, চারদিকে হঠাৎ ধাঁ করে অন্ধকার নেমে এল। সোনা-টিয়ার আর মাকুর কোল থেকে নামবার কথা মনে হলো না। মাকু তো কলের মানুষ। তার মোটেই দুটো ধাড়ি ধাড়ি মেয়ে কোলে করলেও হাত ব্যথা করে না।

তবু কিন্তু মাকুর যেন একটু হাঁপ ধরে যাচ্ছে মনে হলো, অমনি খচমচ করে সোনা টিয়া কোল থেকে নেমে পড়ল। এইখানে দম

ফুরিয়ে গেলেই তো হয়ে গেল। কানখুশকিও আনা হয়নি যে আবার দম দিয়ে দেবে। তা ছাড়া অন্ধকারে চাবির ছ্যাঁদাই-বা খুঁজে পাবে কী করে? তার ওপর একটু দূরেই আলো দেখা যাচ্ছিল। মাকু বলল,'ও কী হলো। নেমে পড়লে যে?'

সোনা একবার টুক করে তার মুখটা দেখে নিয়ে বলল, 'কোলে উঠলে আমার পা কামড়ায়।'

টিয়া হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল, 'খাবার সময় হয়ে গেছে।' সোনা এখন কী করে? পুঁটলির খাবার তো শেষ, ঝেড়ে দেখে খাগড়াগুলোর কিছু বাকি রাখেনি মাকু। টিয়ার চোখ মুছিয়ে চুমু খেয়ে সোনা বলল, 'না, না,

কাঁদে না টিয়া। মাকু আমাদের জন্য খাবার এনে দেবে! দেবে না, মাকু?’

মাকু বললে, ‘সং, খাবার কোথায় পাওয়া যায়?’

সং বললে, ‘কেন, বটতলার সরাইখানায়। আমরা সবাই তো সেখানেই খাই। কিন্তু নগদ পয়সা দিয়ে খেতে হয়। সারাইওলা বাকিতে

কিচ্ছু দেয় না, ওর নাকি বড্ড টাকার দরকার। তোমাদের পয়সা আছে তো খুকিরা?'

সোনা বলল, 'আমার নাম সোনা, আমার ছ-বছর, আর ওর নাম টিয়া, ওর পাঁচ বছর। আমার কাছে একটা পয়সা আছে; ও ছোটো, ও কোথায় পাবে?'

সং তাই শুনে হো হো করে হাসতে লাগল। 'এক পয়সায় একটা কাঁচা লঙ্কাও দেয় যদি সরাইওলা, সেই যথেষ্ট! ব্যাটা টাকার জোঁক, কিন্তু রাঁধে খাসা!'

টিয়া আবার বলল, 'খাবার সময় হয়ে গেছে। আমরা এখন খাই।' সোনার গলার কাছটা আবার ব্যথা করতে লাগল। মাকু দু-জনের পিঠে দু-টি হাত রেখে বলল,

‘কোনো ভয় নেই। চলো, কী খাবার আছে দেখা যাক, আমি পয়সা দেবো।’

সোনা বললে, ‘পয়সা কোথায় পেলে, মাকু?’ মাকু বললে, ‘কেন, আমি করেছি, আমি অনেক পয়সা করি।’

সোনা বলল, ‘ তুমি নাচ, গাও, সাইকেল চালাও, পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দাও, আবার পয়সাও করতে পার?’

মাকু বললে, ‘হুঁ, পয়সা করতে পারি, গোলমাল করতে পারি, হইচই করতে পারি। চলো, এবার বটতলায় সরাইখানায় গিয়ে কিঞ্চিৎ হইচই করা যাক।’

সং যে কখন ওদের ফেলে হনহন করে এগিয়ে গেছে তা কেউ লক্ষ করেনি। মাকুও দু-জনার পুঁটলিসুদ্ধ হাত ধরে এবার আলোর

দিকে এগিয়ে চলল। দূরে কোথাও হুতুমথুম করে প্যাঁচা ডাকতে লাগল, কিন্তু সোনা-টিয়ার একটুও ভয় করল না। এমনি করে একটু চলেই ওরা বটতলার সরাইখানায় পৌঁছে গেল।

তিন

হোটেল বলে হোটেল! সে এক এলাহি ব্যাপার! গাছ থেকে খানকতক বড়ো লণ্ঠন ঝুলছে; গাছের গোড়ায় তিনটি পাথর বসিয়ে প্রকাণ্ড উনুন হয়েছে, তার গনগনে আগুনের ওপর মস্ত পেতলের হাঁড়িতে টগবগ করে কী যেন ফুটছে, চারদিক তার সুগন্ধ মো-মো করছে। মাথার ওপর ডালপালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো গলে আসে, শুকনো পাতা দিয়ে ঢাকা মাটিতে কোথাও ফুটফুট করছে, আবার কোথাও ঘন কালো ছোপ ছোপ ছায়া দেখা যাচ্ছে।

হোটেলের ছিরি কত! বট গাছের নীচু নীচু ডালে রাজ্যের লোক সারি সারি পা ঝুলিয়ে বসে। এখান দিয়ে ওখান দিয়ে, মাঝখান দিয়ে

রাশি রাশি ঝুরি নেমেছে, তাই মুখগুলো তাদের ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কাপড়-জামাগুলোকে কেমন যেন রং-বেরং অদ্ভুত মনে হচ্ছে। গাছের গুঁড়ির ওপর কাঁচা কাঠের তক্তা ফেলে খাওয়া-দাওয়া চলেছে। তার গন্ধে সোনা-টিয়ার জিবে জল এল।

হাতা হাতে হোটেলওলা, মুখেভরা তার ঝুলো গোঁফ আর থুতনি ঢাকা ছাই রঙের দাড়ি, দেখে মনে হয় যেন ধোপার বাড়ি থেকে ফিরেছে। সোনা-টিয়ার বড়ো হাসি পেল। লোকটা কিন্তু বড়ো ভালো, ওদের দেখেই হাতা উঁচিয়ে ডাক দিল, 'এসো এসো, এইখানে বসে যাও, পেট ভরে খাবার খাও, নিজের হাতে রেঁধেছি।'

সোনা-টিয়াকে গাছের ডালে তুলে দিতে হলো, শূন্যে তাদের ঠ্যাং ঝুলতে লাগল, মাকুও ওদের পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসল, তার প্রাণে যে বড়ো ভয়। টিয়া তার কানে কানে সাহস দিয়ে বলল, 'কোনো ভয় নেই, মাকু, দিদি সব ঠিক করে দেবে। তুমি আমার এই রুমালটা হাতে ধরে রাখতে পার।' বড়ো বড়ো গোলাপ ফুলের নকশা-কাটা ছোটো একটি রুমাল টিয়া পুঁটলি থেকে বের করে ওর হাতে গুঁজে দিল।

হোটেলওলা টিনের মগে জল এনে বলল, 'খাবার দিই? তার আগে হাত ধুয়ে ফেলো, কেমন?

মাকু হঠাৎ বললে, 'কী কী আছে?'

হোটেলওলা চটে কাঁই! ‘কী কী আছে আবার কী? রোজ রাতে যা থাকে তাই আছে, অর্থাৎ স্বর্গের সুরুয়া আর হাতের রুটি। একবার চেখে দেখলে অন্য কিছু খেতেও ইচ্ছে করবে না!’

এই বলে তিনটে বড়ো কাঠের বাটিতে সুরুয়া আর শালপাতাতে এক তাড়া হাতরুটি নিয়ে এল।

সোনা বললে, ‘আমাদের বেশি পয়সা নেই, আমাদের কম খেতে দিয়ো। টিয়া, কম করে খাস।’

হোটেলওলা বলল, ‘বালাই, ষাট! কম খেতে দোব কেন? পেট ভরে খাও, এত ভালো কেউ রাঁধতে পারে না, এ আমি নিজেই বলে দিলাম। নাও, ধরো, পয়সাকড়ি কিচ্ছু

দিতে হবে না, তোমরা বরং আমার হোটেলের কিছু কিছু কাজ করে দিয়ো, একা একা আর পেরে উঠি নে।'

টিয়া খুশি হয়ে গেল। 'আমরা পুতুলদের জন্যে কাদা দিয়ে ভাত বানাই। গাঁদা ফুলের পাতা দিয়ে দিদি মাছ রান্না করে।'

হোটেলওলা হেসে বলল, 'তা খুব ভালো তো। কিন্তু এখানে তোমাদের রাঁধতে হবে না, উনুনের নাগালই পাবে না, তোমরা খাবার জায়গা করবে, বাটি ধুয়ে দেবে, ঝাঁটপাট দেবে, কেমন?'

তারপর মাকুর দিকে ফিরে বলল, 'তুমিও কাজ করতে পারবে নাকি?' টিয়া অমনি বলল, 'ও সব পারে। অঙ্ক কষতে পারে, সেলাই কল চালাতে পারে, পেরেক ঠুকতে পারে,

ওর পেটে কল— উঃ!' টিয়া ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। মাকু ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'কী হয়েছে টিয়া, ঘুম পেয়েছে?'

সোনা বললে, 'না, না, টিয়া কাঁদে না, আয় তোকে চুমু খাই। ভুলে চিমটি কেটেছি রে। এই নে, খাবার খা।'

টিয়া অমনি ফিক করে হেসে ফেলল। হোটেলওলা বলল, 'খাবে-দাবে, আমার গেছো-ঘরে শোবে, পয়সাকড়ি লাগবে না। গাছের ধারের ছোটো ঝরনায় চান করবে, কাপড় কাচবে, বাসন ধোবে, কেমন? আমিও বাঁচব, তোমরাও বাঁচবে। দিনে দিনে ব্যবসা যেমন ফেঁপে উঠছে, একা হাতে চলছে না।'

এই বলে মুচকি হেসে হোটেলওলা ফতুয়ার পকেট চাপড়াল, অমনি ভেতর থেকে

পয়সাকড়িও ঝনাৎ ঝনাৎ বেজে উঠল। সোনা-টিয়া ভয়ে ভয়ে দু-টুকরো হাতরুটি সুরুয়াতে ডুবিয়ে মুখে তুলল।

খাসা সুরুয়া, এত ভালো সুরুয়া সোনা-টিয়া জন্মে কখনো খায়নি। বাড়িতে যেদিন সুরুয়া হয় ওরা দু-জন মহা ক্যাঁও-ম্যাও করে। এ অন্য জিনিস, মাকুও দু-হাতে বাটি তুলে লম্বা লম্বা টান দিতে লাগল। ওদের পাশেই কতকগুলো রোগা লোক চেটেপুটে সুরুয়া খেয়ে বলল, 'সাধে এর নাম হয়েছে স্বর্গের সুরুয়া! এমন সুরুয়া আর কেউ বানাক দেখি! আগের মালিক রাবিশ রাঁধত, সবাই রেগে যেত। হঠাৎ একদিন ভোল বদলে গেল, সবাই খুশি! অথচ মালিক এমন চালাক যে কাউকে শেখাবে না। তার মানে সব শেখাবে,

খালি শেষের পাটে লুকিয়ে লুকিয়ে কী যে মশলা ঢালে, সেটি কাউকে বলবে না।’

আরেক জন হাতরুটি দিয়ে বাটির তলা মুছে, টুকরোটা মুখে ফেলে বলল, ‘আজকাল কিন্তু এত ভালো রাঁধে যে নিজের হোটেলে নিজে খায়। আগে খেত না, বলত ওসব খেয়ে যদি আমার ব্যামো হয়, তখন তোদের জন্য রাঁধবে কে শুনি? ওর জন্য তখন জাদুকর রোজ খিচুড়ি বানিয়ে দিত। এখন এখানেই খায়।’

তাই শুনে হোটেলওলা হেসে বলল, ‘তা আর খাব না? এত ভালো খাবার আর কোথায় পাব, সেইটে বলো? তা ছাড়া, এ-রকম না করলে আমার পয়সা জমবে কী করে? জাদুকর কান মুচড়ে টাকা নিত না? এখন নিজের হোটেলে মিনিমাগনা থাকি খাই আর

লাভের টাকা গুণে তুলি। টাকার যে আমার বড়ো দরকার!'

তারপর ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে রোগা লোকেদের তাড়া দিতে লাগল, 'নে, নে, এবার ওঠ দিকি, শোবার আগে একবার খেল মকশো করতে হবে-না! শেষটা গায়ে এমনি গতর লেগে যাবে যে আর দড়াবাজির খেলা দেখাতে হবে না, এখন ওঠ দেখি সব।'

অমনি ঝুপঝাপ করে যে-যার গাছের ডাল থেকে নেমে পড়ল। নিমেষের মধ্যে তক্তা তুলে গুঁড়ি হটিয়ে, তারা অনেকখানি ফাঁকা জায়গা করে নিল। সেখানে মগডাল অবধি উঁচু যেন সার্কাসের তাঁবুর ছাদ। সর সর সর করে জনা পাঁচেক ডালপালা বেয়ে উঠে পড়ল। ওপরে কোথায় যেন দড়িদড়া গোঁজা

ছিল, দেখতে দেখতে টান করে দড়ি বাঁধা হয়ে গেল, তার দু-মাথা থেকে দুটো দোলনা ঝুলতে লাগল।

সোনা-টিয়া তো হাঁ, চোখ থেকে ঘুম কোথায় পালিয়ে গেল। মাকুকে খোঁচা দিয়ে বলল তারা, 'দ্যাখ, মাকু, দ্যাখ, মগডাল থেকে উলটো হয়ে ঝুলতে কেমন দ্যাখ রে!' সত্যি সত্যি এক জনের হাত ধরে এক জন ঝুলে নিমেষের মধ্যে নীচের মাটিতে যারা ছিল তাদেরও টপটপ করে ওরা তুলে নিল। তারপর হোটেলওলা তাল দিতে লাগল আর দড়ির ওপর সে যে কত দৌড়, কত ঝাপ, কত ডিগবাজি, কত নাচ। চমকে গিয়ে জিব কামড়ে মাঝখানে টিয়া একটু কেঁদে নিল, তারপরে ওপর থেকে ঝুপঝাপ করে এক

জনের পিঠে এক জন যেমনি নেমে পড়ল টিয়াও না হেসে পারল না।

খেলা শেষ হলে হোটেলওলা ওদের পাশে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে বলল, ‘মকশো না
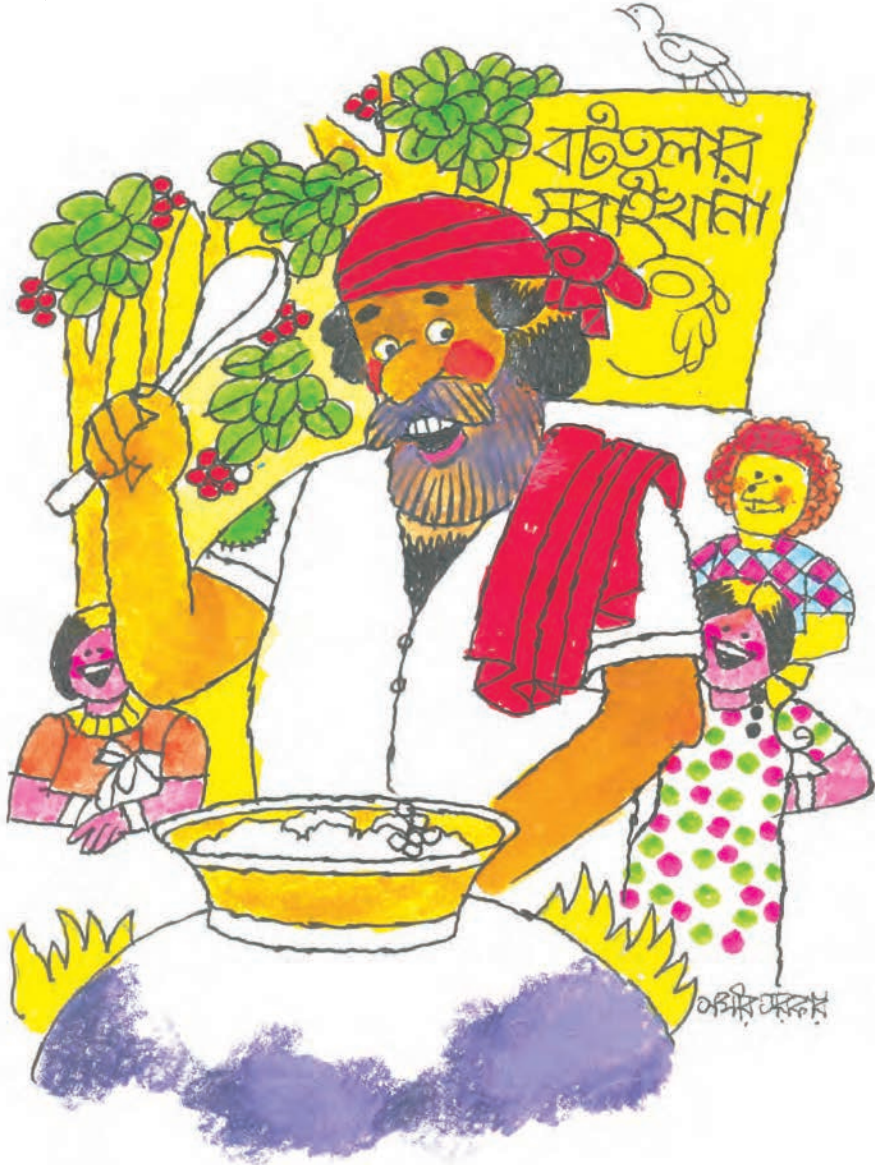
করলে কি চলে? ওরা সার্কাসের লোক, বিদ্যা ভুলে গেলে খাবে কী? খুঁচিয়ে তাই অভ্যাস করাই। এবার চলো, গেছো-ঘরে শোবে চলো, চোখ তোমাদের জড়িয়ে আসছে।'

ছোটো একটি হাই তুলে সোনা বলল, 'বাসন ধোব না? আমরা তোমার চাকর-না?' হোটেলওলা সোনাকে টপ করে কোলে তুলে বলল, 'তোমাদের যে এক বেলার চাকরি। দু-বেলা চাকর রাখার সংগতি কোথায় আমার?' তারপর মাকুকে বলল, 'নাও, টিয়াকে নিয়ে চলো।'

গাছের গায়ে সিঁড়ির মতো খাঁজ কাটা; আট-দশটা ধাপ উঠতেই ডালপালার মধ্যে কাঠের তক্তা দিয়ে কী সুন্দর ঘর। বাতাস বইলে দোলনার মতো দোলে; শুকনো পাতার

ওপর নীল চাদর বিছানো; পুঁটলি মাথায় দিয়ে শোবামাত্র সোনা-টিয়ার ঘুমে চোখ বুজে এল। কিন্তু ঘুমের মধ্যে মাকু যদি পালায়; অন্ধকারে ঘোর জঙগলে, হঠাৎ চাবি ফুরিয়ে এলিয়ে পড়লে, শেয়ালে কিংবা খরগোশে যদি

মাকুকে টেনে নিয়ে যায়? যেন মনে হলো মাকু ঘুমিয়েছে, পুঁটলির মুখের বড়ো সেফটিপিন দিয়ে নিজের ফ্রকের সঙ্গে সোনা মাকুর জামার কোণটা এঁটে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। মাকুর রাতে পালানো বন্ধ হলো।

দখিন হওয়ার দোল খেয়ে খেয়ে সারারাত সোনা টিয়া ঘুম দিল, জাগল যখন সকাল বেলায় পাখির গানে কান ঝালাপালা হলো আর ডালপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো চোখে এসে লাগল।

চোখ খুলেই সোনা দেখে সর্বনাশ হয়ে গেছে, সেপটিপিন দিয়ে ফ্রকের সঙ্গে আঁটা মাকুর জামাটা পড়ে আছে, কিন্তু মাকু নেই! 'মাকু, মাকু' করে কেঁদে ফেলল সোনা। তাই শুনে মাকু, মামণি, বাপি, আর আম্মার জন্যে

টিয়াও মহাকান্না জুড়ে দিল। কান্না শুনে গাছ বেয়ে মাকু, হোটেলওলা, সং আর সাতজন দড়াবজির ওস্তাদ ওপর উঠে এল। সং বলল, 'ধ্যেৎ তোদের মতো বোকা তো আর দেখিনি। চাকরটা কি হাতমুখও ধোবে না, খাবেদাবেও না নাকি? এক্ষুনি জাদুকরের জাদু হবে আর তোর চ্যাঁ ভ্যাঁ করছিস! এরা কী রে!'

অমনি সোনা টিয়া লাফিয়ে উঠল, 'কোথায় জাদুকর, কখন খেলা হবে?' মাকু বলল, 'তোমরা হাত-মুখ ধুয়ে, দুধ-রুটি খেয়ে উঠলে তারপর!'

টিয়া বলল, 'আকাশ থেকে পরিদের রানিকে নামাবে?'

সোনা বলল, 'চুপ, বোকা!'

মাকু একটু যেন ঘাবড়ে গেল। বলল, ‘আচ্ছা, চলো তো নীচে।’

সোনা মাকুর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, ‘না মাকু, না, পরিদের রানি ভালো না, আমরা দেখতে চাই না।’

সং বলল, ‘ওমা! চাই না আবার কী! একবার দেখলে মুন্ডুটি ঘুরে যাবে, চলো-না একবার। একবার একটি কলের মানুষ—’

সোনা-টিয়া দু-জন এইখানে দু-হাত দিয়ে সঙের কথা বন্ধ করে দিল। সং তো এমনি অবাক হলো যে তার গাল থেকে দুটো বড়ো বড়ো আঁচিল খুলে পড়ে গেল। সেগুলোকে তুলে নিয়ে সং আবার যার যেখানে টিপে বসিয়ে দিল।

চাকরির কথা ভুলে গিয়ে সোনা-টিয়া খেতে বসে গেল, মাকু তাদের ডালের ওপর তুলে দিয়ে, কাজে লেগে গেল। সোনা টিয়াকে ফিসফিস করে বলল, 'লোকের সামনে ওকে মাকু বলে ডাকিস নে, তাহলে ধরে নেবে।'

আর সবাই কখন খেয়ে যে-যার নিজের কাজে চলে গেছে, বটতলার হোটেল খাঁ খাঁ করছে। মাকুকে হোটেলওলা বললে, 'ওরা খেতে বসুক, তুমি তিনজনের হয়ে খেটে দাও, কেমন? কী যেন নাম তোমার? তারপর সবাই মিলে জাদুকরের খেলা দেখা যাবে।'

সোনা একবার টিয়ার দিকে, এক বার মাকুর দিকে চেয়ে বলল, 'ওর নাম বেহারি। ও জাদুর খেলা দেখতে চায় না, টিয়া আর আমি দেখব, ও ঝরনায় বাসন ধোবে।'

কিন্তু মাকু কিছুতেই রাজি হয় না, বলে, 'আমিও টপ করে কাজ সেরে নিয়ে জাদু দেখব। বেহারি বললে কেন?'

টিয়া বলল, 'ছি, তাড়াতাড়ি করে বাসন ধোয় না, তাহলে ভেঙে যায়। বেহারি আমাদের বাড়িতে বাসন ধোয়।'

মাকু বলল, 'কাঠের বাসন আবার ভাঙে নাকি? আমি খেলা দেখব, আকাশ থেকে পরিদের রানি নামানো দেখব।' অমনি সোনা-টিয়ার সে কী কান্না। 'না, না, না, ও জাদু দেখবে না। ও হোটেলওলা, ওকে যেতে বলো।'

হোটেলওলা মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। 'দ্যাখো বাপু, বনের মধ্যে বাঁশতলায় আমি খরগোশ ধরবার ফাঁদ পেতেছি, সেখানে গিয়ে

তুমি বরং খরগোশ পড়ল কি না দেখে এসো।
বুড়ো হাবড়া, নাই-বা দেখলে জাদুর খেলা!’

অমনি সোনা জানতে চাইল খরগোশ ধরা কেন, কী হবে খরগোশ দিয়ে।

শুনে সঙের কী হাসি! 'কী আবার হয় খরগোশ দিয়ে? কালিয়া হবে। মালিকের রান্না খরগোশের কালিয়া একবার খেয়ে দেখো!'

সোনা-টিয়ার দম বন্ধ হয়ে এল। চাপা গলায় টিয়া বললে, 'কী রকম খরগোশ! সাদা? লাল চোখ?' বলেই দু-জনে দু-হাতে চোখ চেপে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদতে বসে গেল। সং বললে, 'ভ্যালা রে দামোদর নদী! আরে না, না, সব খরগোশ কি আর সাদা হয়? কী বলো মালিক?'

হোটেলওলা মাকুকে বললে, 'দ্যাখো, বেহারি, সাদা খরগোশ পেলে দু-টি এনো, এরা পুষবে; বাকি ছেড়ে দিয়ো। আর কালো কুচ্ছিত দুষ্টু খরগোশ পেলে আমাকে দিয়ো,

কালিয়া রাঁধব। আহা, দুষ্টু কালো খরগোশের কালিয়া যে না খেয়েছে তার জন্মই বৃথা!'

মাকু ওদের কানে কানে বলল, 'কোনো ভয় নেই, সাদা খরগোশ আমি সব ছেড়ে দেবো।' টিয়া বললে, 'সব ছাড়বে না মোটেই, দিদি আর আমি দুটোকে পুষবো। আমারটার নাম গঙ্গা, দিদিরটার নাম যমুনা।' সোনা বললে, 'দুৎ,আমারটার নাম গঙ্গা, তোরটার নাম যমুনা।' এই বলে দিল টিয়ার কান ধরে এক টান! টিয়া কাঁদবে বলে হাঁ করেছে, ঠিক সেই সময় হট্টগোল করতে করতে ঝুড়ি-ঝোড়া দলবলসুদ্ধ জাদুকর এসে উপস্থিত। মাথায় লম্বা চোঙার মতো টুপি, গায়ে চকরা-বকরা মাটি অবধি ঝোলা জামা,

তার ঢলঢলে হাতা। সোনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

—'ও টিয়া, ও টিয়া, জামার হাতা থেকে কেমন বড়ো বড়ো রাজহাঁস বেরোয় দেখেছিলাম, মনে নেই?' তারপর মাকুর দিকে ফিরে বলতে যাবে, 'রাজহাঁস বেরুনো দেখে যাও, মাকু,' কিন্তু মাকু ততক্ষণে চলে গেছে।

জাদুকর গোছগাছ করছে, দু-চারজন দর্শকও এসে জুটেছে, এদিকে হোটেলওলা হন্তদন্ত হয়ে গাছের গোড়ায় কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। সোনা জিজ্ঞেস করল, 'কী খুঁজছে বলো-না? টিয়া একবার বাপির গাড়ির চাবি খুঁজে দিয়েছিল।' টিয়া খুশি হয়ে গেল। 'সেই যে আম্মার মশলার কৌটা খুঁজে দিয়েছিলাম মোড়ার তলা থেকে!' অমনি আম্মার কথা

মনে পড়াতে দু-জনের গলা টনটন করে উঠেছে। তাদের চোখে জল দেখে, হোটেলওলা বললে, ‘ছি, কাঁদে না, আজ যে আমার জন্মদিন, আজ রাতে ভোজ হবে, ঘাসজমিতে সার্কাস হবে, তাই এরা এতো মহড়া দিচ্ছে, তাও জান না?’

শুনে সোনা টিয়া মহা খুশি। তার দাড়িতে চুমু খেয়ে ওরা বললে, ‘তা হলে কী দেবো তোমার জন্মদিনে?’

টিয়া পুঁটলি খুলে একটা ছোটো কাঁচি বের করে বলল, ‘এটাই নাও, তোমার জন্মদিনে, স্নেহের সোনা-টিয়া।’

সোনার চোখ গোল হয়ে গেল। ‘ওমা, টিয়া কী দুষ্টু মেয়ে, এইটা-না-মামণির নখ কাটার কাঁচি, মামণি যদি রাগ করে?’

—‘ছি, টিয়া, মামণির কাঁচি নেয় না।’ হোটেলওলাও ব্যস্ত হয়ে উঠল, ‘না, না, কাঁচি দিয়ে আমি কী করব? নখফক আমি আদপেই কাটি না। তার চেয়ে বরং আমার হারানো জিনিসটা খুঁজে দিয়ো কেমন? সেটা না পেলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।’

ওরা ওকে ছেঁকে ধরল, ‘কী হারানো জিনিস বলো মালিক!’ হোটেলওলা বললে,‘এখন নয়, জাদু খেলার পর, দুপুরের রান্না চাপাব, তোমরা আলু সেদ্ধর খোসা ছাড়িয়ে দেবে, তখন বলব। এখন খেলা দেখো, নইলে ওরা মকশো করবে না, তাহলে সব ভুলে যাবে, সার্কাসে খেলা দেখতে পারবে না, খেতে পাবে না ওরা তখন। সবাই শুকিয়ে মরে

যাবে।’ এই বলে দাড়ি দিয়ে মালিক একবার চোখ মুছে নিল।

সোনা বলল, ‘সার্কাসের লোক তো বনের মধ্যে কেন?’ হোটেলওলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে

বলল, ‘বলেনি বুঝি সং? নতুন তাঁবু কিনে, বড়ো ঝাড়বাতি কিনে, সকলের নতুন পোশাক বানিয়ে চারদিকে নতুন খেলার বিজ্ঞাপন দিয়ে, খেলা শুরু হবার আগেই কোনো জিনিসের দাম না দিয়ে, কাউকে কিছু না বলে, ওদের অধিকারীমশাই যে পালিয়েছে! দোকানদাররা থানায় খবর দিয়েছে, জিনিসপত্র সব টেনে নিয়ে আটক করেছে, অধিকারীমশাই নিখোঁজ, তাই এদের নামেই পরোয়ানা বের করেছে, দেখা পেলেই ধরে নিয়ে ফাটকে দেবে। তাই এই জঙ্গলের মধ্যে ওরা গা-ঢাকা দিয়ে আছে। আমি খাওয়াই-দাওয়াই যেটুকু পারি মওড়া দেওয়াই, দুঃখী লোকেদের সাহায্য করতে হয়।’

আরও কী বলতে যাচ্ছিল হোটেলওলা! কিন্তু তখুনি পোঁ-ও-ও শব্দ করে জাদুকরের সাকরেদ বাঁশিতে টান দিল। আর সঙ্গেসঙ্গে মাটির ওপর জড়ো-করা মোটা দড়ি গাছা কিলবিল করে জ্যান্ত হয়ে উঠল।

জাদুকর তখন শূন্যে হাত ছুঁড়ে সুর করে বলল, 'তোমরা সবাই চুপ!

লাগ্ ভেল্কি লাগ
আকাশ পানে তাগ!
তাড় হাঁকড়া
পাখি পাকড়া
লাইস্মা পড়িস ঝুপ্।'

সঙ্গেসঙ্গে সাঁ করে দড়ির একটা মাথায় ঢিল ফাঁসের মতো লেগে সবসুদ্ধ মগডাল

অবধি উঠেই আবার সোঁ করে নেমে এল। সোনা-অবাক হয়ে দেখল, কোত্থেকে কখন একটা কালো টাট্টু ঘোড়া এসে দাঁড়িয়েছে কেউ দেখেনি, তারই পিঠে ঝুপ করে যখন দড়ি গাছা নামল, টাট্টু ঘোড়ার সোনালি জিনের ওপর দাঁড়িয়ে স্বয়ং পরিদের রানি!

চার

সোনা-টিয়া হাঁ করে চেয়ে রইল। পরিদের রানির গোলাপি মুখে কী সুন্দর কালো কালো চোখ, মাথায় সোনালি চুল, পরনে রুপোলি পোশাক, কোমরে জাদুকরের দড়ি জড়ানো। যেই ঘোড়া মাথা নেড়েছে আর ঘণ্টার মালা ঝুমুর ঝুমুর বেজে উঠেছে, অমনি এক ঝাঁকি দিয়ে দড়ির ফাঁস ঝেড়ে ফেলে পরিদের রানি দুই ঘোড়ায় পা রেখে নেচে উঠেছে। সে কী

নাচ! নাচ দেখে গাছের উপর থেকে টুপটাপ করে রাশি রাশি ফুল ঝরে পড়তে লাগল আর জাদুকর সঙ্গে সঙ্গে লম্বা একটা চোঙের মতো বাঁশি বাজাতে লাগল। তারপর কখন এক সময় বাঁশি থামিয়ে জাদুকর আবার দড়ির ফাঁস তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। দড়ি গিয়ে পরিদের রানিকে জড়িয়ে ধরে, পাক খেতে খেতে তাকে সুদ্ধ আবার গাছের মগডাল অবধি উঠে গেল।

আর কিছু দেখা গেল না, শুধু এক রাশি লাল ফুলের সঙ্গে দড়িগাছা ছপাৎ করে আবার এসে মাটিতে পড়ল।

হোটেলওলা সোনা-টিয়ার কানে কানে বলল, 'এমন খেলা কেউ কখনো দেখেছে? আমাদের জাদুকর হলো গিয়ে জাদুকরের

রাজা। চলো এবার রাঁধাবাড়ার কাজে লাগা যাক। এ-বেলায় মাছের স্টু-ভাত আর রাতের সুরুয়া এখনই তৈরি করে রাখতে হবে যে! মনে নেই আজ রাত্রে আমার জন্মদিনের ভোজে সকলের নেমন্তন্ন। ভুনিখিচুড়ি, হরিণের মাংসের কোর্মা আর পায়েস। সেইসঙ্গে সুরুয়া না দিলে আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। উটি আবার লুকিয়ে করতে হয়, নিয়মটা কাউকে জানাবার মতো নয়।'

বটতলার পেছন দিকে রান্না হয়, তারই পাশ দিয়ে সেই ছোটো নদীটি বয়ে চলেছে। তিনটি করে বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে উনুন হয়েছে, তাতে কাঠের জ্বালে বিরাট পেতলের হাঁড়ি চাপানো হয়। সোনা-টিয়া সুরুয়া খাবার কাঠের বাটিগুলো নদীর জলে ভালো করে

ধুয়ে সারি সারি উপুড় করে একটা চ্যাপটা পাথরের উপর সাজিয়ে রাখল। তারপর হোটেলওলার স্টুয়ের জন্য ছোট্ট ছোট্ট বুনো মটরশুঁটি ছাড়িয়ে দিল।

হোটেলওলা বলল, 'এগুলো এমনি হয়, কিনতে হয় না। আগে এখানে লোকের বসতি ছিল কি না, তখন তারা মটরের বিচি পুঁতেছিল, এখন ঝাড় বেঁধে আপনি হয়। গাছতলায় মিষ্টি শাঁকালু হয়, পালং শাক হয়, টমেটো হয়; ডুমুর গাছে ডুমুর হয়, শজনে গাছে শজনে হয়। বাকি জিনিস গ্রামের হাট থেকে কিনে আনতে হয়।'

সোনা বলল, 'কে কিনে আনে?'

হোটেলওলা বললে, 'কেন, সং তো হপ্তায় তিন বার গাঁয়ের পোস্টাপিসে যায়, সে-ই

কতক আনে। আর কতক আমার ভাই লুকিয়ে দিয়ে যায়।'

—'কেন সং হপ্তায় তিন বার পোস্টাপিসে যায়।'

—'ওমা , সে যে লটারির টিকিট কিনেছে, যদি একবার জিতে যায় তো একসঙ্গে অনেক টাকা পেয়ে বড়োলোক হয়ে যাবে। তাই খবর আনতে যায়। খুব সাবধানে যেতে হয়, কারণ ওরা যে এখানে লুকিয়ে আছে থানার দারোগা একবার জানতে পারলে, সবসুদ্ধ পায়ে বেড়ি দিয়ে টেনে গারদে পুরবে।'

এই বলে মাথায় হাত দিয়ে হোটেলওলা চুপ করে বসে রইল।

সোনা বলল,'বলো হোটেলওলা, তোমার ভাই কেন লুকিয়ে-চুরিয়ে বনের মধ্যে আসে?'

—‘তার বড়ো ভয়।’

—‘কীসের ভয়?’

—‘সকলের যে ভয় সেই ভয়, অর্থাৎ ধরা পড়ার ভয়। আর বেশি জিজ্ঞাসা কোরো না সোনা-টিয়া, ছোটো মেয়েদের খুব বেশি জানতে চাওয়াটা মোটেই ভালো নয়।’

এই বলে লাফিয়ে উঠে হোটেলওলা উনুনে-চাপানো সুরুয়ার হাঁড়ির ঢাকনি খুলে এই বড়ো একটা কাঠের হাতা দিয়ে নাড়াতে লেগে গেল আর অমনি তার মুখ থেকে দাড়ি গোঁফজোড়া খুলে টপ করে হাঁড়িতে পড়ে সুরুয়ার সঙ্গে টগবগ করে ফুটতে লাগল। সোনা-টিয়া হাঁ—হাঁ করে ছুটে এল, কিন্তু হোটেলওলা এক হাতে ওদের ঠেলে ধরে, অন্য হাতে সুরুয়া ঘুঁটতে লাগল। তার

চাঁচাছোলা ন্যাড়া মুখটাতে মুচকি হাসি দেখে সোনা-টিয়া অবাক !

উনুন থেকে লম্বা লম্বা জ্বলন্ত কাঠগুলোকে টেনে বের করে ফেলে, তাতে বালতি বালতি জল ঢেলে আগুন নিবিয়ে, কোমরের গামছা দিয়ে হাত-মুখ মুছে ফেলে, হোটেলওলা কাঠের হাতা দিয়ে সুরুয়া থেকে দাড়িগোঁফ তুলে, বালতির জলে ধুয়ে অমনি গাছের ডালে শুকুতে দিল। আর ট্যাঁক থেকে আরেক জোড়া দাড়িগোঁফ বের করে নিল ! তারপর সোনা-টিয়ার দিকে ফিরে ফিক করে হেসে বলল, 'আগে কেউ আমার সুরুয়া মুখে দিলেই ওয়াক থুঃ বলে ফেলে দিত আর রোজ পয়সা ফেরত চাইত। তারপর একদিন দাড়িগোঁফ আচমকা সুরুয়ার মধ্যে পড়ে গিয়ে ওর সঙ্গে

রান্না হয়ে গেল। আমি ভয়ে মরি, এবার ওরা আমার পিঠে চ্যালাকাঠ না ভেঙে ছাড়বে না! কিন্তু কী আর বলব, সেদিন সুরুয়া খেয়ে সবার মুখে সুখ্যাতি আর ধরে না, জাদুকর

ওর নামই দিয়ে দিল ‘স্বর্গের সুরুয়া’—তোমরা যেন আবার দাড়িগোঁফের কথা কাউকে বোলো না, তাহলে আমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না।’

সোনা-টিয়া বলল, ‘কেন, হোটেলওলা, দেখতে পাব না কেন?’

—‘সে অনেক কথা, বললেও তোমরা বিশ্বাস করবে না। এখানে সবাই জানে আমি বটতলার হোটেলওলা, পয়সার কুমির। কিন্তু আসলে আমি যে কে, কেন টাকা জমাই তা কেউ জানে না। আমি গোঁফ দিয়ে মুখ ঢেকে লুকিয়ে থাকি সাধে? আমাকে চিনলে ওরা আমায় আস্ত রাখবে না! দাড়িটাকে কত ভয়ে ভয়ে শুকুতে দিতে হয়, তাও কেউ জানে না! ভাগ্যিস এই সময় ঘাসজমিতে জানোয়ারদের

খেলা দেখতে সবাই যায়, নইলে আমাকে দেখতে পেতে না। এমনিতেই একটু পায়ের শব্দ শুনতে পেলেই আঁতকে উঠি!'

ঘাসজমিতে জানোয়ারদের খেলার কথা শুনে সোনা-টিয়া কি আর সেখানে থাকে? শেষপর্যন্ত হোটেলওলাই ভিজে দাড়িগোঁফটি পকেটে পুরে ওদের কিছুটা পথ এগিয়ে দিল। এমন সময় দেখা গেল ভারী একটা হাঁড়িপানা মুখ করে মাকু আসছে। তারই কাছে সোনা-টিয়াকে ভিড়িয়ে দিয়ে হোটেলওলা রান্না শেষ করতে ফিরে গেল।

—'কই, আমাদের দুটো খরগোশ কই, মাকু?'

—'বাঁশঝাড়ে খরগোশ-টরগোশ দেখলাম না।'

—'তোমার চাবি ফুরিয়ে যাচ্ছে নাকি মাকু? হাঁড়িমুখ করেছ কেন?'

মাকু তো অবাক, 'সে কী, চাবি আবার ফুরুবে কী?'

সোনা-টিয়ার কানে কানে বলল, 'দূর বোকা, চাবির কথা ও জানবে কী করে? ও ভাবে ও সত্যি মানুষ!'

মাকু ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'ছিঃ! কানে কানে কথা বলতে হয় না! অন্য লোকেরা তাহলে মনে দুঃখ পায়।'

দু-জনায় মাকুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'না মাকু না, তোমাকে আমরা খুব ভালোবাসি। ঘাসজমি কত দূরে?'

—‘এই যে এসে পড়লাম, শব্দ শুনতে পাচ্ছ না?’

সত্যিই কানে এল ঝম-ঝম ট্যাম-ট্যাম ভ্যাঁ-পু-পু-পু ভোঁ। আনন্দের চোটে ওদেরও পাগুলো নেচে উঠল। তারপর গাছপালা পাতলা হয়ে এল, মস্ত ফাঁকা নয় মোটেই। খানিকটা খোলা জায়গায় ঘিরে গোল হয়ে ভিড় করে রয়েছে একদল মানুষ। এদেরই অনেককে কাল রাতে সোনা-টিয়া বটতলার হোটেলে খেতে দেখেছিল। সোনা-টিয়াদের দেখে সবাই হই হই করে উঠল, ‘আজ রাতে-না মালিকের জন্মদিনের ভোজ? হোটেলের চাকররা তাহলে কেন সকাল

বেলায় গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে? কাজকর্ম নেই নাকি?'

সোনা বলল, 'গায়ে ফুঁ দিইনি মোটেই।'

টিয়া বলল, 'আমরা ছোটো, আমরা কি কাজ করতে পারি?'

মাকু বলল, 'তা ছাড়া আমরা তো জানোয়ারদের খেলা দেখতে এসেছি।'

যেই-না বলা অমনি ঢ্যাম-কুড়ু-কুড়ু করে বাজনা বেজে উঠল আর ঘাসজমিতে এক পাশের চাটাইয়ের ঘরের দরজা খুলে দশটা কোঁকড়া চুল কুকুর পেছনের দু-পায়ে দাঁড়িয়ে, সামনের দু-পা দিয়ে লাল ফিতে বাঁধা করতাল বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে এল।

ট্যাম-কুড়-কুড় ট্যাম-কুড়-কুড় ট্যাম-কুড়-কুড় ভ্যাঁপু ভ্যাঁপু ভ্যাঁপু—ভোঁপর ভোঁপর ভোঁ! ব্যাস, কুকুরেরা এক লাফ দিয়ে উঠে এক পায়ে পাঁই পাঁই করে ঘুরতে লাগল। আর অমনি টগর বগর করে চারটে বাঁদর টুপি মাথায় দিয়ে চারটে ঘোড়া হাঁকিয়ে উপস্থিত! সং এসে মাঝখানে দাঁড়িয়ে কতরকম খেলা দেখাল তার ঠিক নেই।

দেখতে দেখতে বেলা বাড়তে লাগল, খেলা যখন শেষ হল সূর্যটা প্রায় মাথার ওপর। আর দেরি করা নয়, ভিড় ঠেলে তিন জনে বটতলার দিকে পাঁই পাঁই ছুট। একা একা রাজ্যের কাজ নিয়ে হোটেলওলা না-জানি কত কষ্টই পাচ্ছে। মাঝপথে আবার এক

কাণ্ড। ওরা দেখে একটা খাকি কোট-পেন্টেলুন পরা লোক, থলে কাঁধে, কোমরে লন্ঠন বাঁধা, হাতে একটা লম্বা খাম নিয়ে ঝোপে-ঝাড়ে কাকে যেন খুঁজে

বেড়াচ্ছে। দেখেই তো সোনা-টিয়ার হয়ে গেছে, এবার আর মাকুর রক্ষা নেই, ওকে ধরে নিয়ে যেতেই যে লোকটা এসেছে সন্দেহ নেই। আবার দারোগার কাছ থেকে চিঠি এনেছে ভালো করে খুঁজবে বলে লণ্ঠন এনেছে, থলিতে ভরে নিশ্চয় বেঁধে নিয়ে যাবে! ঘড়িওলাই হয়তো ওকে জেলে পুরতে চায়!

আর কি সেখানে থাকা যায়? মাকুর দু-হাত ধরে টানতে টানতে সোনা-টিয়া মস্ত একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকোল। ইদিক-উদিক তাকাতে তাকাতে বনের মধ্যে ঢুকে পড়লে পর, ওরা বেরিয়ে এক দৌড়ে একেবারে বটতলা। হোটেলওলা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। তার মাথা থেকে পা অবধি

কালো কাপড়ে ঢাকা, দূর থেকে ওদের পায়ের শব্দ শুনেই লোকটা সুড়ুৎ করে বনের মধ্যে গা ঢাকা দিল।

—'কে ওই লোকটা। ও হোটেলওলা, ও কেন এসেছে?'

হোটেলওলা বলল, 'কে আবার লোক? লোক কোথায় দেখলে আবার? সেই তখন থেকে একলা একলা খেটে মরছি, গয়লা এক মন দুধ দিয়ে গেছে, সং পাঁচ সের বাতাসা কিনে এনেছে, রাতে ভুনিখিচুড়ি হবে, তার জন্য সুগন্ধি চাল, পেস্তা, বাদাম, কিশমিশ এনেছে, শিকারিরা হরিণের মাংস দিয়ে যাবে বলে গেছে, তাল তাল মশলা পড়ে আছে, কিন্তু কাজ করার মানুষেরা সব তামাশা দেখতে গেছে।'

এই বলে হোটেলওলা গাল ফুলিয়ে ঢোল বানিয়ে পাথরটার ওপর বসে পড়ল। মাকু আর কোনো কথা না বলে উনুনে দুটো চ্যালা কাঠ গুঁজে দিয়ে বিরাট দুধের কড়াইটা চাপিয়ে দিল। ওর গায়ের জোর দেখে সোনা-টিয়া অবাক। হোটেলওলা, 'ও মানুষ, তোমার গায়ে তো দেখছি পাঁচটা মোষের শক্তি, তা কাজে এত গাফিলতি কেন?'

টিয়া বলল, 'ও যে কলের মা—'। সোনা ওর মুখ টিপে ধরে বলল, 'চুপ, বোকা!' মাকু আর হোটেলওলা অবাক হয়ে দু-জনার দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ টিয়া ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। 'মাকুর চাবি ফুরিয়ে গেলে মাকু মরে যাবে। আমাদের ভাত খাবার সময় হয়ে গেছে, অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ!'

হোটেলওলা আর মাকু দু-জনে ছুটে এসে ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে, বাতাসা খাইয়ে টিয়ার কান্না থামিয়ে ওদের স্নানের জোগাড় করতে চলে গেল। গাছ-ঘর থেকে সাবান এল, গামছা এল, রান্নার তেল থেকে তেল ঢেলে গায়ে মাখা হলো। তারপর হোটেলওলা পায়েস রাঁধতে বসল। ছোটো নদীর জলে ওরা স্নান করল, মাকু গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দিল। পাটুলি থেকে পাউডার বের করে ওরা মুখে সাদা করে মেখে নিল, আম্মার ভাঙা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে, মাকুকে বলল, 'ভাত দাও।'

অমনি হোটেলওলা আর মাকু গাছের গুঁড়ি সোজা করে, তার ওপর তক্তা পেতে টেবিল বানিয়ে ফেলল। কানা-তোলা কাঠের থালায় সোনা-টিয়াকে স্টু-ভাত এনে দিল।

চারিদিকে পায়েসের গন্ধে মো-মো করছে, আর দলে দলে সার্কাসের লোকেরা খাবার জন্য হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। হোটেলওলা পায়েস কড়াইয়ের ওপর বারকোশ চাপা দিয়ে বলল, 'এ বেলা খালি স্টু-ভাত, কই, পয়সা দেখি। পায়েস আর ভুনিখিচুড়ি মাংস ওবেলা পাবে, মাগনা—বিনি পয়সায়।'

চারিদিকে খালি চাকুমচুকুম, তারি মধ্যে উঠি-পড়ি করে সং এসে হাজির। তার চুল সব খাড়া, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ফোঁসফোঁস নিশ্বাস পড়ছে, জামাকাপড়ে ধুলোবালি শুকনো পাতা। ধপাস করে একটা গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ে সে বললে, 'সর্বনাশ হয়েছে, সব বোধ হয় জানাজানি হয়ে গেল। বনে পেয়াদা সেঁদিয়েছে!'

সঙ্গেসঙ্গে যে-যার থালা-বাটি নিয়ে দুড়দাড় করে কোথায় যে গা ঢাকা দিল কে বলবে। নিমেষের মধ্যে বটতলা ভোঁ-ভোঁ, ভিড়ের সঙ্গে মাকুও হাওয়া! জিনিসপত্র যেখানকার যেমন পড়ে রইল, হোটেলওলা সোনা-টিয়াকে নিয়ে তরতর করে গাছ-ঘরে গুম হলো।

পাঁচ

গেছো-ঘরে শুধু চুপচাপ বসে থাকা, নিশ্বাস বন্ধ করে, কান দুটোকে খাড়া করে। কিছু দেখা যায় না, গাছের পাতার ঘন ঝালর গেছো-ঘরকে আড়াল করে নিরাপদে রাখে। সোনা-টিয়াও কিছু দেখতে পায় না। খালি মনে হয় নীচে কেউ পট পট মট মট করে

হেঁটে বেড়াচ্ছে, ছোঁক ছোঁক করে শুঁকছে। খিদেয় ওদের পেট চোঁ চোঁ করে।

একটু পরে লক্ষ করে, গেছো-ঘরের দেয়াল ঘেঁষে এক পাশে কালো চাদর মুড়ি দিয়ে কে শুয়ে আছে,ভয়ে সোনা-টিয়ার হাত পা ঠান্ডা হয়! এই সেই কালিয়ার বনের ভয়ংকর নয় তো , যার গা থেকে বন্দুকের গুলি ঠিকরে পড়ে যায়? হোটেলওলার দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে দু-জনে কাঠ হয়ে পড়ে থাকে। হোটেলওলা ওদের পিঠে হাত বুলিয়ে অভয় দেয়।

গেছো-ঘরের কেঠো মেঝের ফুটোতে চোখ লাগিয়ে হোটেলওলা দেখে কেউ কোথাও নেই, সব নিরাপদ। কালো মানুষটাকে ঠেলা দিয়ে বলে, 'পেছন পেছন রাজ্যের বিপদ টেনে নিয়ে আসিস কেন?'

কালো-কাপড় রেগে যায়, চাদর ফেলে উঠে বসে বলে 'তা আসব না? আমি না এলে রোজ রোজ কে তোমার গোঁফ-দাড়ি সরবারহ করবে শুনি?'

টিয়া বললে, 'কেন, সং করবে। ও তো রোজ পোস্টাপিসে যায়!'

লোকটি চটে গেল। 'রেখে দাও তোমাদের ন্যাকা সঙের কথা। কবে এক টাকা দিয়ে লটারির টিকিট কিনে বসে আছে, তাই দিয়ে নাকি সে বড়োলোক হবে! এদিকে গুণের তার অন্ত নেই। যেই পোস্টমাস্টার ছোটো জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে, কই, না তো, খবরের কাগজে লটারির কথা লেখেনি তো! অমনি ডুকরে কেঁদে পিটটান দেয়! ও কী দাদা, হলো কী?'

হোটেলওলা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে গেছো- ঘরে খোঁজাখুঁজি লাগিয়ে দিল। সোনা বলল, 'কী হারিয়েছে তাই বলো-না, টিয়া খুব ভালো খুঁজে দেয়। মামণির চাবি খুঁজে দিয়েছিল।'

টিয়া অমনি ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল , 'মামণির কাছে যাব। আমার খিদে পেয়েছে!' কান্না দেখে হোটেলওলা আর কালো লোকটা সোনা-টিয়াকে কোলে করে নামিয়ে এনে আবার খাবারের বাটির সামনে বসিয়ে দিল। এতক্ষণে সোনা-টিয়া চিনতে পারল—ওই না ঘড়িওলা! 'অ্যাঁ, ঘড়িওলা, তুমি কেন এলে? তোমাকে দেখলে কাঁদার কলের জন্য চেপে ধরবে-না?'

ঘড়িওলা বললে, 'এই, চুপ, চুপ!'

কথাটা অবিশ্যি হোটেলওলার কানে যায়নি, সে নীচে নেমেই আবার কী যেন খুঁজতে আরম্ভ করেছে! খানিক বাদে ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ল। 'সর্বনাশ হয়েছে, সং তার লটারির টিকিটের আধখানা আমাকে রাখতে দিয়েছিল, কানে গুঁজে রেখেছিলাম, কোথায় পড়ে গেছে! এখন সেটিকে কিছুতে যদি খেয়ে ফেলে থাকে, তবেই তো গেছি! ও টিয়া, সত্যি খুঁজে দেবে তো ?'

টিয়া বলল,'দেবো, দেবো, খেয়ে-দেয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে, খুঁজে দেব। ঘড়িওলা বনের মধ্যে কেন এলে?'

হোটেলওলা বলল, 'বাঃ,তা আসবে না? ও যে আমার ছোটো ভাই, নইলে দাড়ি আনবে

কে? তা ছাড়া ওকে কলের পুতুল খুঁজে বেড়াতে হয়, এদিকে নিজের দেখা দেবার জো নেই। তার খাটনি কত? মাঝে মাঝে স্বর্গের সুরুয়া খেয়ে না গেলে পারবে কেন?'

টিয়া বলল, 'কিন্তু—কী'

সোনা হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরল,' এই, চুপ, চুপ।'

হোটেলওলা আবার উঠে টিকিট খুঁজতে লাগল। ঘড়িওলা বলল, 'আর পারি নে। বলি, তোফা আছ এখানে আমার দাদার আস্তানায়, মাকুর হদিশ পেলে? তা ছাড়া তোমাদের সঙ্গে বেহারি বলে যে লোকটা এসেছে, আশা করি তার কাছে আবার হাঁড়ির কথা ভাঙোনি?'

টিয়া সত্যি কথাই বলল, ‘বেহারি আমাদের চাকর, আমাদের বাড়িতে বাসন ধোয়। মাকুকে পেলে কী করবে? হাসি-কান্নার কল এনেছ?’

ঘড়িওলা রেগে গেল। ‘রাখো তোমাদের হাসি-কান্নার কল। তা ছাড়া একটু একটু হাসতে পারে মাকু, ঠোঁটের কোণের কব্জা খুললেই মুখটা হাসি হাসি দেখায় আর কান্নার কলটল করা আমার কম্ম নয়। আমার পয়সাকড়ি বিদ্যেবুদ্ধি সব গেছে ফুরিয়ে। এবার মাকুকে একবার পেলে হয়, সটান থানায় দিয়ে দেব। আর ফেরারি হয়ে ঘুরতে ভালো লাগে না। মা-র জন্য মন কেমন করে।’

অমনি টিয়া বলল, ‘আমারও মামনি, বাপি, আম্মা, ঠামু আর নোনোর জন্যে মন কেমন করে!’ বলেই ভ্যাঁ করে কান্না জুড়ল। তাই দেখে ঘড়িওলা বেজায় বিরক্ত, ‘কথায় কথায় অত চোখের জল কীসের গা? দামোদর নদী নাকি! এত করে বললাম— মাকুকে খুঁজে দাও, হ্যান্ডবিল পর্যন্ত দিলাম, অথচ খোঁজার নামটি নেই!’

টিয়া চটে গিয়ে কান্না থামিয়ে সবে বলেছে, ‘মাকু তো’ অমনি সোনা তার ঠ্যাং ধরে টেনে গাছের ডাল থেকে নীচে নামিয়ে আনল, গুঁড়িতে মাথা ঠুকে আলু হল, এবার কান্না থামতে পাঁচ মিনিট।

কান্না থামলে ঘড়িওলা আবার বললে, ‘মাকুর চালাকি এবার বের করছি, কতকগুলো

চাকা আর স্প্রিং আর চকমকি ইত্যাদির তেজ দেখো-না! এবার সব যন্ত্রপাতি খুলে আলাদা আলাদা থলেয় পুরে বাছাধনকে—'

হোটেলওলা শেষের কথাগুলি শুনে অবাক হয়ে গেল।

—‘কেন গো , মাকু- না তোমার প্রাণের কলের পুতুল, মানুষ থেকে যার কোনো তফাৎ নেই, অথচ মানুষের চেয়ে যে শতগুণে ভালো, যেমনটি বানিয়েছ তেমনটি করে , আমাদের ছেলেপুলের মতো ত্যাঁদড় নয়— আজ আবার উলটো কথা শুনি কেন?’

ঘড়িওলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, ‘এখন আর তা নয়, দাদা, যেমনটি ভেবে বানিয়েছিলাম, এখন আর তা নেই। কলের মধ্যে কী যেন অন্য শক্তি গজিয়ে গেল ,মাকু এখন ইচ্ছেমতো চলে বলে, আমার বড়ো-একটা তোয়াক্কা রাখে না। আমার প্ল্যানমতো যদি চলত, এমন বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত কখনো? অবশ্যি আমিও মোটেই চাইনে যে সে আমাকে খুঁজে পায়

অমনি তো কাঁদার কল করে আর তিষ্ঠুতে দেবে না। নেহাৎ এতদিনেও তোমরা কেউ তাকে দেখতে পাওনি বলেই বুঝেছি এ-বনে সে নেই, তাই দু-দন্ড বসে গল্প করছি! ব্যাটাকে পেলে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে ওর গায়ের কোনো দু-টুকরো একসঙেগ রাখব না।' সোনা-টিয়া শিউরে উঠল। হোটেলওলা বলল, 'এত রাগ কীসের?

—হবে না রাগ? সতেরো বছর ধরে, বাড়িঘর ছেড়ে, ঘড়ির কারখানায় যে পড়ে রইলাম সে তো শুধু মাকুর জন্যই। নইলে ম্যানেজার আমাকে উদয়াস্ত খাটিয়ে ঘড়ির ঘরের তাকের নীচে শুতে দিয়েছে আর ছাইপাঁশ খেতে দিয়েছে। তাইতেই আমি সারারাত জেগে গুদোমে পড়ে থাকা রাজ্যের পুরোনো বিলিতি

ঘড়ির কলকব্জা খুলে নিয়ে, ওর পেটে পুরতে পেরেছি। ফালতু পড়ে ছিল যে জিনিস, মরচে ধরে নষ্ট হচ্ছিল, কেউ দেখছিল না , এখন শুনছি তারি দাম নাকি পাঁচ হাজার টাকা! ওই পাঁচ হাজারের জন্য আমার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে। এবার চাবি ফুরুলেই দেব পুতুলটাকে যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে, ধুয়ে খাক্, আমার কী?'

এই বলে ঘড়িওলা দুবার চোখ মুছল। হোটেলওলা বলল , 'অত ভাবনা কীসের বুঝি না। ছ মাস মাকুর খেলা দেখালে অমনি তোর কত পাঁচ হাজার উঠে আসবে, তখন পাঁচের বদলে সাত হাজার দিয়ে কলকব্জাগুলো কিনে নিতে পারবি!'

ঘড়িওলা হাত- পা ছুঁড়ে চ্যাচাতে লাগল, ‘কোন চুলোয় খেলা দেখাবটা শুনি? রঙ্গমঞ্চটা কোথায়? সার্কাসপার্টি নিখোঁজ, অধিকারী ফেরারি, না আছে তাঁবু না আছে গ্যাসবাতি, পালোয়ানরা সব জন্তুজানোয়ার নিয়ে বনের মধ্যে সেঁধিয়েছে। ও কথা আর মুখে এনো না কাপ্তেন—’

মালিক তাকে কাছে ডেকে বোঝাতে লাগল, এই সুযোগে টিয়ার হাত ধরে পা টিপে টিপে সোনা বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মাকুকে সাবধান করে দিতে হবে।

টিয়া বললে, ‘ মাকু যদি কথা না শোনে?’

সোনা গম্ভীর বয়ে গেল, ‘মাকুকে বাঘ ধরার ফাঁদে ফেলে দেবো আর উঠতেও পারবে না, কেউ খুঁজেও পাবে না!’

টিয়ার কান্না পেল, 'আর যদি বেরুতে না পারে?' শেষটা যদি খেতে না পেয়ে—

'চুপ, টিয়া চুপ। ঘড়িওলা চলে গেলে জাদুকর দড়ি দিয়ে মাকুকে তুলে আনবে। ছি, কাঁদে না, আজ-না মালিকের জন্মদিন? সঙের লটারির টিকিটের আধখানা খুঁজে দিতে হবে-না? আজ যে জানোয়ারদের খেলা হবে, মালিকের জন্মদিন বলে কত রান্নাবান্না হচ্ছে দেখলে না?'

টিয়া ঢোক গিলে বলে, 'বড়ো গর্তে ফেলবে না ছোটো গর্তে ফেলবে। মাকুর লাগবে না?'

সোনার হাসি পায়, 'কলের পুতুলের আবার লাগে নাকি? লাগলে লোকেরা কাঁদে, মাকুর কাঁদার কলই নেই তো কাঁদবে কি?

টিয়া বললে, ‘তা হলে বড়ো গর্তেই ফেলে দাও, নইলে যদি আবার বেরিয়ে এসে বলে, এই যে আমি মাকু, আমাকে কাঁদার কল দাও!’

সোনা একটু চুপ করে থেকে বলল, ‘আমি মাকুকে কাঁদার কল দেবো। মাকু আমাদের

জন্য প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল জাদুকরের কাছ থেকে এনে দেবে আর আমি ওকে কাঁদার কল দেবো না?'

টিয়া তো অবাক, 'আছে তোমার কাছে?'

সোনা বুক ফুলিয়ে বললে, 'নেই, কিন্তু বানিয়ে দেবো। ওর মুন্ডু খুলে তার ভেতরে কাঁদার কল বসিয়ে দেবো। মাকু তখন তোর মতো ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদবে!'

বলতে বলতে সত্যি সত্যি দু-জনে বাঘধরার বড়ো ফাঁদের কাছে এসে গেল। অনেক দিনের পুরোনো ফাঁদ। বনে যখন বসতি ছিল তখন গাঁয়ের লোকেরা বাঘ ধরবার জন্য করেছিল। জাদুকর বলেছিল, বাঘ মোটেই নয়, বুনো শুয়োরে ওদের শস্য খেয়ে ফেলে নষ্ট করত, তাদের ধরবার ফাঁদ

এগুলো। মাটিতে দু-মানুষ গভীর গর্ত খুঁড়ে তার ওপরে কাঠকুটো লতা-পাতা দিয়ে ঢেকে রাখত, শস্য খেতে এসে তার মধ্যে শুয়োর পড়ে যেত আর শস্য খাওয়া ঘুচত। তাই শুনে শুয়োরের জন্য টিয়া একটু কেঁদেও নিল। এখন ফাঁদের মুখটা লতাপাতা গজিয়ে ঢেকে গেছে, না দেখে কেউ পা দিলে ঘপাৎ করে পড়ে যাবে।

তাই যেখানে যেখানে ফাঁদ পাতা, সেখানে হোটেলওলা একটা করে বাঁশের খুঁটি পুঁতে রেখেছে, লোকে যাতে দেখতে পেয়ে সাবধান হয়। সার্কাসের জানোয়ারদের জন্যই বেশি ভয়। সোনা একবার এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে, বড়ো ফাঁদের কিনারা থেকে বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলে দিল। এর মধ্যে মাকুকে

ফেলতে হবে; তা হলে আর কেউ তাকে খুঁজে পাবে না, যতক্ষণ না সোনা-টিয়া দেখিয়ে দেয়। আর ভয় নেই।

টিয়া বলে, ‘দিদি, যদি ওর মধ্যে সাপ থাকে, কাঁকড়াবিছে থাকে, মাকুকে যদি কামড়ায়?’ ‘চুপ, টিয়া চুপ, কথায় কথায় অত কান্না আবার কী! মাকু তো কলের পুতুল, সাপ বিছে আর কী করবে?’

তবু টিয়ার কান্না পায়। সে কেঁদে বললে,‘আমি কলের পুতুলকে ভালোবাসি, প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল কোথায়, মামনি বাপি কোথায়?’

তাই শুনে সোনাই-বা করে কী, দু-জনে মহাকান্না জুড়ে দিল। কখন যে বড়ো চিঠি হাতে করে পেয়াদা এসে হাজির হয়েছে ওরা টেরই পায়নি। পেয়াদা হাঁক দিল, ‘ও খুকিরা,

এ- বনে যারা থাকে তারা কোথায় গেল বলতে পারো? সেই ইস্তক খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছি, অথচ কারো টিকির দেখা পাই নে। এ চিঠি যথাস্থানে না পৌঁছলে আমার চাকরি থাকবে না। বলি, কথা শুনতে পাচ্ছ?'

পেয়াদা এসেছে ঘড়িওলাকে ধরতে, মাকুকে ধরতে, সার্কাসের লোকদের ধরতে, আর কি সোনা-টিয়া সেখানে থাকে! দৌড়, দৌড়! পেয়াদাও সমানে চ্যাচাতে লাগল, 'শোনো, শোনো, বটতলায় কারা খাওয়া-দাওয়া করে? ও খুকিরা, কথার উত্তর দাও-না কেন? দাঁড়াও, তোমাদের ধরছি!'

এই বলে যেই-না পেয়াদা ওদের পেছনে দৌড়েছে, সে কী মড়মড় হুড়মুড়! পেয়াদা পড়েছে ফাঁদে।

ছয়

সোনা আর সেখানে দাঁড়াল না, টিয়ার হাত ধরে ঘাসজমির দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। টিয়াকে নিয়েই মুশকিল। ও খালি দাঁড়াতে চায়, খালি বলে, 'ওর পায়ের ছাল উঠে যায়নি তো? আইডিন দিতে হবে না?' ও-কথা ভাবলে সোনারও কান্না পায়, তাই আর থামা নয়, পথ ছেড়ে বনের মধ্যে দিয়ে দৌড়াতে থাকে। থেকে থেকে মুখের সামনে দুই হাত তুলে চোঙা বানিয়ে ডাকে--- 'মাকু-উ-উ-উ---!' টিয়াও ডাকে 'মাকু-রে-এ-এ-এ!' কেউ সাড়া দেয় না, বনটা যেন আরও ঘন হয়ে ওঠে।

দৌড়তে দৌড়তে হাঁপ ধরে, জল তেষ্টা পায়, থামতে হয়। অমনি কানে ঝিম ঝিম

শব্দ হয়। গাছের পাতার মধ্যে বাতাস শোঁ—শোঁ করে। ডালের উপর থেকে কী যেন ছোটো জানোয়ার চিড়িক চিড়িক শব্দ করে। যেন হিক্কা তুলছে। টিয়ার হাত ধরে গাছতলা থেকে পায়ে-চলা পথে টেনে এনে, সোনা বলে, 'তক্ষক সাপ, ভারি বিষাক্ত!' বলেই টিয়ার মুখ চেপে ধরে, তাই আর তার কান্না জোড়া হয় না। সোনা তার কানের কাছে বলে, 'দ্যাখ্, দ্যাখ্! টিয়া, ওই দ্যাখ্!' টিয়া অবাক হয়ে দেখে, মস্ত একটা ছুঁচোর মতো জানোয়ার আরও বড়ো একটা ব্যাঙের ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। ব্যাংটা মাটির ওপরে হিঁচড়ে চলেছে, কীরকম একটি চিঁচি শব্দ করেছে। পথের ধার থেকে একটি ছোটো শুকনো ডাল তুলে সোনা কিছু বলবার আগেই, দিয়েছে

টিয়া ছুঁচোর মাথায় এক বাড়ি! ব্যাং ছেড়ে পত্রপাঠ ছুঁচোর পলায়ন।

ব্যাংটা ভারি অবাক হয়ে গেছে বোঝা গেল। একটুক্ষণ চোখ পিটপিট করতে করতে কামড়ানো ঠ্যাংটা নিজের মুখে পুরে চুষে নিল। তারপর তিড়িং করে চার লাফে অদৃশ্য। সোনা-টিয়াও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ওই যাঃ, মাকুর কথা যে আর একটু হলেই ওরা ভুলে যাচ্ছিল। ঘড়িওলা কী নিষ্ঠুর! মাকুকে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খুলে খুলে থলেয় পুরে দোকানদারকে ফিরিয়ে দেবে! কক্ষনো না! মুখ তুলে সোনা-টিয়া আবার ডাক দেয়— 'মাকু—উ-উ-উ-উ!' গাছের উপর থেকে কানে আসে--- ক্ক-র-র-র-র--- ক্কু-র-র-র-র। চোখ তুলে চেয়ে দেখে,

ওপারের ডালে বসে মা-দাঁড়কাক নীচের ডালে বসা ছানা-দাঁড়কাককে পোকা খাওয়াচ্ছে। দু-জনেই প্রায় সমান বড়ো। কিন্তু মা-দাঁড়কাকের মুখের ভিতরটা কালো কুটকুটে, আর ছানা-দাঁড়কাকের মুখের ভেতরটা লাল টুকটুকে।

তাই দেখে টিয়া থমকে দাঁড়ায়, সোনা তাড়া দেয়, 'ওরে চল চল, শেষটা মাকুকে ধরে যদি টুকরো করে তাহলে পরে?' আবার দৌড় দৌড়! টিয়া আবার বলে, 'দুষ্টু লোকদের ব্যথা লাগলেও কিছু হয় না, না দিদি?'

সোনা ঢোঁক গিলে বলে, 'ব্যথা লাগলে চলতেও পারবে না, মাকুকে ধরতেও পারবে না।'

টিয়া চোখ মুছে আবার দৌড়ায়, সোনাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। দুষ্টু লোকেদের জন্য বড্ড কষ্ট লাগে। ছুটতে ছুটতে ওরা ঘাসজমিতে পৌঁছে যায়, তবু মাকুর দেখা মেলে না।

ঘাসজমিতে মহা হইচই, হোটেলওলার জন্মদিনের উৎসবের মহড়া চলছে। ওরা দেখল সংকে খুব খাটানো হচ্ছে; একটা লোক জানোয়ারদের পা ধুয়ে পালিশ লাগাচ্ছে। আর সং আঁতিপাঁতি ওষুধের শিশি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

টিয়া বললে, 'কীসের ওষুধ? ওদের কি অসুখ করেছে?' দড়াবাজির লোকেরা মহা চটে গেল, রাতে খেলা দেখানো হবে, এখন ওসব অলুক্ষুনে কথা মুখে আনা কেন? অসুখ করবে কেন? ওদের ভিটামিনের বড়ি

খাওয়াতে হবে-না? না তো কি অমনি অমনি খেলা দেখাবে? খেলা দেখানো অত সোজা নয় বুঝলে?' ধমক খেয়ে সোনা-টিয়ার কান্না পেল, ওদের চোখের জল দেখে, সংই কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল। তারপর যেই-না রুমাল দিয়ে চোখের জল মোছাবে বলে নিজের ঢলকো ইজেরের পকেটে হাত দিয়েছে, অমনি পকেট থেকে ছোটো সবুজ কৌটো বেরিয়ে এসেছে। সঙের আনন্দ দেখে কে, 'পেয়েছি,পেয়েছি!' একগাল হেসে টপাটপ করে এক টুকরো গুড়ের সঙ্গে জানোয়ারদের গালে একটি করে বড়ি ফেলে দেয়, তারাও সেই খেয়ে মাথা দুলিয়ে ল্যাজ নেড়ে আহ্লাদে আটখানা। মনে হলো খুব মিষ্টি খেতে।

কী ভালো দেখাচ্ছে জানোয়ারদের ! সবাই আজ স্নান করেছে, গায়ে মাথায় বুরুশ ঘষছে। গলার কলার ঘন্টি আজ সব পরিষ্কার ঝকঝক করছে। সার্কাসের লোকেদের পোশাকও

রোদে দেওয়া হয়েছে। দড়িতে যে কালো মেম ছাতা নিয়ে নাচে, সে একটা বড়ো ছুঁচ আর সুতো নিয়ে ছেঁড়া জায়গা জোড় দিচ্ছে। নতুন কাপড়-জামা ওরা কোথায় পাবে?

মেম একগাল হেসে পরিষ্কার বাংলায় সোনা টিয়াকে বলল, 'আমি আজ সোনালি ঘুন্টি দেওয়া লাল গাউন পরব। তাতে নতুন করে জরির ফিতে লাগিয়েছি। তোমরা বার্থডে পার্টিতে কী পরে যাবে?'

সোনা-টিয়া তো হাঁ! তাই তো, কী হবে তা হলে? ওদের সঙ্গে যে ওই একটা বই দুটো ফ্রক নেই! কাল থেকে পরে আছে, কুঁকড়ে-মুকড়ে একশা হয়ে গেছে। দু-জনে নিজেদের জামার দিকে তাকিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। সং ছুটে এল, 'কী মেম, ওদের

কাঁদাচ্ছ কেন? কাঁদার কী আছে গা? হোটেলের চাকর বেহারি যে তোমাদের জন্যে জামা কিনবার পয়সা দিয়েছিল, তাও জানো না? এই দেখো, কী সুন্দর জামা এনেছি, এই পরে তোমরা পার্টিতে যাবে!'

কোত্থেকে দুটো কাগজের বাক্স এনে সং ওদের হাতে গুঁজে দেয়।

টিয়া অবাক হয়ে বলে, 'বেহারি? এখানে বেহারি এসেছে নাকি? তাহলে মামনিও—'

সোনা তাকে এক ঝাঁকি দিয়ে কানে কানে বলে, 'চুপ, বোকা, বেহারি হলো মাকু, মনে নেই? এখানে ওর নাম করিস না কখনো!'

টিয়া যা কাঁদুনে, হয়তো আরেকবার ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে নিত, যদি-না সং তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে জামা দুটো দেখাত। কী সুন্দর জামা

সে বলা যায় না। একটা গোলাপি, একটা ফিকে বেগুনি! তলায় কুঁচি দেওয়া, গলায় ছোট্ট একটা করে রুপোলি ফুলের মতো বোতাম। দেখেই সোনা-টিয়া হেসে ফেলল। মেম উঠে এল, দু-জনের হাতে দু-টুকরো রেশমি ফিতে দিয়ে বলল, ‘এই নাও, হোটেলওলার জন্মদিনে তোমাদের প্রেজেন্ট। ও বেলা চুলে বো বেঁধো। সং ওদের জুতো পালিশ করিয়ে দাও।’

ওমা, যে লোকটা ঘোড়ার খুরে পালিশ লাগাচ্ছিল, সে-ই তাড়াতাড়ি এসে ওদের জুতোতেও ওই পালিশ লাগিয়ে, ন্যাকড়া ঘষে আয়নার মতো চকচকে করে দিল।

হাসিমুখে সোনা জিজ্ঞাসা করল,‘বেহারি কোথায়?’

অমনি সবাই একটু গম্ভীর হয়ে গেল। সং ছাড়া ওকে এরা কেউ বোধ হয় তেমন পছন্দ করে না।

দড়াবাজির ছেলেরা বলল, 'চাকরের আবার অত দেমাক বুঝি না! গটগট করে চলে ফেরে, কটমট করে তাকায়, ঠোঁট ফাঁক করে সহজে দুটো কথা বলে না। কেন? আমরা কি ফেলনা নাকি। হোটেলের চাকর কীসে আমাদের চেয়ে ভালো হলো শুনি? মোট কথা, সে অনেকক্ষণ আগে এখান থেকে চলে গেছে, আর না ফিরলে বাঁচি!'

তাই শুনে টিয়া রেগে-মেগে আর একটু হলেই সব কথা ফাঁস করে দিয়েছিল আর কী, ভাগ্যিস সোনা বুদ্ধি করে ঠিক সেই সময়ে

জিজ্ঞেস করল, ‘আজ বিকেলে কী কী খেলা হবে বলো-না।’

—‘হ্যাঁ? প্রথমেই হবে দড়াবাজি।’

দড়াবাজির ছোকরারা বলল, ‘গোড়াতেই জমিয়ে দিতে হবে কিনা, নইলে লোকে শেষ অবধি বসে থাকবে কেন বলো? দড়াবাজির মতো খেলা হয় না,এ- কথা কে না জানে—’ সং বাধা দিয়ে বলল, ‘তারপর কুকুরদের খেলা, তারপর জাদুকরের—’।

টিয়া চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, ‘জাদুকর পরিদের রানিকে নামাবে?’

—‘ওমা— তা নামাবে না? নইলে আবার খেলা কীরকম হলো? ওই দ্যাখো, রানির পোশাক রোদে শুকুচ্ছে!

বাস্তবিকই তাই। ঘাসের ওপর এতখানি জায়গা জুড়ে পরিদের রানির সাদা ধবধবে পোশাক পাতা রয়েছে, তার সর্বাঙ্গে ছোটো ছোটো রুপোলি বুটি তোলা, পাশেই রুপোলি ডানা-জোড়াও শুকুচ্ছে। তার পাশে কাগজের বাক্স খোলা পড়ে আছে, তার মধ্যে পরিদের রানির মাথার তারা-দেওয়া মুকুট, হাতের চাঁদ-বসানো রাজদণ্ড, গলার সীতাহার, হাতের তাগা, কানের ঝুমকো। দেখে দেখে সোনা-টিয়া আর চোখ ফেরাতে পারে না। গয়নার সঙ্গে রুপোলি পাড়-দেওয়া সাদা রেশমি রুমালও রোদে শুকাচ্ছে।

—'কিন্তু রানি কই?' প্রশ্ন শুনে দড়াবাজির ছোকরাদের খুক খুক করে সে কী হাসি!

সোনা-টিয়ার চকচকে চোখ দেখে মেম বলে, ‘কী বেবিরা, তোমরাও আজ রাতে নতুন জামা গায়ে দিয়ে একটু নাচো- গাও না কেন? কী বলো লোকজনরা?’

তাই শুনে লোকজনদেরও মহা উৎসাহ, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোনা-টিয়াও নাচবে গাইবে। কী, তোমরা নাচতে গাইতে জানো?

সোনা-টিয়া খিল খিল করে হেসে ফেলল। নাচতে-গাইতে জানে না আবার কী? এই-না সেদিন স্কুলের দুই ক্লাসের সব মেয়ে মিলে ফুলের মালা গলায় দিয়ে হাত ধরাধরি করে করে, ‘ফুলকলি, আসে অলি গুন্‌গুন্‌ গুঞ্জনে’--- নাচল গাইল, গার্জেনরা কত হাততালি দিল!

তক্ষুনি সোনা-টিয়া হাত ধরাধরি করে একটুখানি নেচে গেয়ে দেখিয়ে দিল। সবাই মহা খুশি!

ঠিক এমনি সময়ে, হন্তদন্ত হয়ে, ঘোড়ার খেলা দেখায় যারা তারা ছুটে এল। সংকে বলল—'এক্ষুনি এসো—ভীষণ ব্যাপার—!' 'ভীষণ ব্যাপার' শুনেই আবার সোনা-টিয়ার মাকুর কথা মনে পড়ে গেল। ওরা এখানে দিব্যি নাচ-গান করছে, আর ওদিকে মাকু যদি বটতলার সরাইখানায় গিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকে, তাহলে এতক্ষণে হয়তো স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে ঘড়িওলা—; আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে, টিয়ার হাত ধরে,বটতলার দিকে সোনা দৌড় দিল।

মেম ডেকে বলল, ‘ওমা! নতুন জামা নেবে-না?’

ফিরে এসে, জামা ফিতে নিয়ে আবার ছুটল ওরা।

সাত

দৌড়োয় আর হাঁপায় টিয়া, সোনা হাঁপায় না। টিয়া বলে, ‘তুই মাকুকে কাঁদার কল দিবি, না দিদি? তাহলে মাকু আর পালাবে না। কোথায় পাবি কাঁদার কল? ঘড়িওলা বানিয়ে দেবে?’

টিয়ার বুদ্ধি দেখে সোনার রাগ ধরে। ‘ঘড়িওলা কোত্থেকে দেবে, টিয়া? শুনলে-না মাকুকে তৈরি করতেই ওর সব বিদ্যে ফুরিয়ে গেছে? তুমি কী বোকা!’

টিয়ার পিঠে গুম করে একটা কিল বসিয়ে, সোনা বলল, ‘আমার কাছে জিনিসপত্র আছে,

আমি বানিয়ে দেবো। চল।' কাঁদতে ভুলে গিয়ে টিয়া আবার দৌড়োতে শুরু করে। এমনি সময়ে সামনে দিয়ে একেবারে ওদের নাকঘেঁষে প্রকাণ্ড বড়ো রঙিন প্রজাপতি উড়ে যায়। এত বড়ো প্রজাপতি ওরা কখনো দেখেনি। সোনার দুটো হাতের তেলো পাশাপাশি জুড়লে যত বড়ো হয়, তার চেয়েও বড়ো। আর কী রঙের বাহার, গায়ে নীল, সবুজ, সাদা, কালো বর্ডার দেওয়া, লাল সুতো আঁকা রামধনু রঙের চোখ বসানো।

আর কথা নেই, হাঁ করে পথ ছেড়ে ওরা প্রজাপতির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে থাকে। প্রজাপতি গাছের গোড়ায় ভুঁইচাঁপা ফুলের মধু খায়, ওরা হাঁ করে চেয়ে দেখে; কাছে গেলেই উড়ে পালায়।

প্রজাপতি মগডালে বুনো বাতাবি লেবুর ফুলে বসে, ওরা ডাল ধরে নাড়া দিলেই উড়ে পালায়। কখনো উঁচুতে কখনো নীচে ওড়ে, রোদে বসে ডানা কাঁপায়, ওদের সাড়া পেলেই উড়ে পালায়।

দৌড়ে দৌড়ে দৌড়ে সোনা-টিয়া আর পারে না, পা ব্যথা করে। এমনি সময় দুটো বেঁটে করমচা গাছের ডালের মধ্যে ঝোলানো বড়ো মাকড়সার মোটা জালে প্রজাপতির পা জড়িয়ে যায়, সোনা- টিয়ার প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যে !

করমচার ডালের আড়ালে বসে মাকড়সা সব দেখেছে, যেই না সুতো বেয়ে প্রজাপতি ধরবে, সোনা হাত বাড়িয়ে জাল ছিঁড়ে দেয়, প্রজাপতি আবার উড়ে পালায়।

টিয়া বললে, ‘দিদি, ধরলি না যে?’

সোনা বললে, ‘আম্মা বলছে প্রজাপতিদের ডানার রঙের গুঁড়ো হাতে লেগে গেলে আর প্রজাপতিরা উড়তে পারে না, মাটিতে পড়ে যায়।’

—‘তারপর কী হয়?’

—‘কাগরা ওদের ঠোকরায়, মাকড়সারা চুষে খেয়ে ফেলে, প্রজাপতিরা মরে যায়!’

টিয়া ভ্যাঁ করে কেঁদে বলে, ‘না, মরে যায় না। তুই ওদের জাল থেকে খুলে দিস, ওরা উড়ে বাড়ি চলে যায়, ওদের মার কাছে! আমি মামনির কাছে যাব।’

সোনা ঢোক গিলে টিয়ার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বললে, ‘কাঁদছিস যে, মাকুকে খুঁজে বের করতে হবে না?— ও কীসের শব্দ?’

বলতে বলতে কখন ওরা আবার বাঘের ফাঁদের কাছে এসে পড়েছে, ঝোপেঝাড়ে আগাছায় আড়াল-করা গর্তের মুখ, তারি ভিতর থেকে সে কী চ্যাঁচামেচি। সোনা ফিসফিস করে বলল, 'দুষ্টু লোকটা মরে যায়নি, ওই শোন চ্যাঁচামেচি করছে!'

আর সেখানে নয়, একদৌড়ে সোনা-টিয়া আবার বটতলার হোটেলে এসে হাজির!

হোটেলে মহা ভিড়, সবাই ব্যস্ত। সর্বনাশ হয়ে গেছে। সং জানোয়ারদের ভিটামিনের বদলে ভুল করে কড়া জোলাপ খাইয়ে দিয়েছে। এখন আর মাত্র পাঁচ ঘন্টা বাদে, হোটেলওলার জন্মদিনের পার্টি। মহড়াই বা হবে কখন, সাজবেই-বা কখন, খেলা দেখাবেই-বা কী করে? জানোয়াররা কাত

হয়ে পড়ছে, সং মনের দুঃখে বুক চাপড়াচ্ছে। সব বুঝি পণ্ড হয়।

টিয়া বলল, 'পণ্ড হবে কেন? আমরা যে নাচব, গাইব। দড়াবাজির লোকেরা দড়িতে চড়বে। জাদুকর পরিদের রানিকে নামাবে---কিন্তু জোড়া ঘোড়া কোথায় পাবে?— ও সং, ঘোড়াদের কেন জোলাপ খাওয়াতে গেলে?'

ভাবনার চোটে কালো চাদর খুলে ফেলে দিয়ে ঘড়িওলা সকলের সামনে বেরিয়ে পড়েছে। সে বললে, 'আ সর্বনাশ! এমন দিনে এমন কাজ করতে আছে? তাও যদি আমার মাকু কাছে থাকত গো; সে একাই বাজিমাত করে দিত। আহা, ফাস্ট ক্লাসের বাবুরা তার কী প্রশংসাই-না করেছিল, তাও তো সব

দেখেনি। মাকু আমার কলের মানুষ হলে কী হবে, ওর ক্ল্যারিওনেট বাজানো যে একবার শুনেছে, সে কি আর ভুলতে পেরেছে—

কোথায় রোজ খেলা দেখিয়ে আমাকে বড়োলোক করে দেবে, তা নয়, পরিদের রানিকে বে করার বায়না!'

এই অবধি শুনেই টিয়া মহা রেগে গেল, 'তবে যে বলেছিল মাকুর কলকব্জা খুলে থলেয় পুরবে, যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবে, তাই তো আমরা মাকুকে—'

সোনা-টিয়ার গালে ঠাস করে এক চড় লাগাল, টিয়া কথা ছেড়ে ভ্যাঁ, আর ঘড়িওলা ভয়ে কুঁচকে এতটুকু হয়ে গেল। তার পেছনে যে হুলিয়া লেগেছে, দুঃখের চোটে সে-কথা ভুলে, সবার সামনে মাকুর কথা বলে ফেলে এখন নিজের মাথায় কী সর্বনাশ ডেকে আনল কে জানে!

কিছুক্ষণ সবাই থুম হয়ে রইল। ঘড়িওলা ভয়ে দুঃখে চিৎকার করে বলল, ‘দাওনা এবার সবাই মিলে ঠ্যাং ধরে টেনে আমাকে গারদে ঠুসে! হ্যাঁ, আমি ঘড়ির দোকানের গুদাম থেকে কলকব্জা চুরি করে, সতেরো বছর খেটে মাকুকে বানিয়েছি। তাই আমার পেছনে পেয়াদা লেগেছে। এক মাস যদি মাকুর খেলা দেখাতে পারতাম, সব ধার শুধে, কলকব্জার দাম চুকিয়ে কোঁচড়-ভরা টাকা নিয়ে, মার কাছে ফিরে যেতে পারতাম। ওমা, মা রে, কোথায় গেলি রে , কদ্দিন মোচার ঘণ্ট খাইনি।’

ঘড়িওলা ডুকরে কাঁদতে থাকে, সোনা-টিয়াও সঙ্গ ধরে, হোটেলের মালিক ঘড়িওলার বড়ো ভাই, তারও মায়ের জন্য

মন কেমন করে, সে গলা খাঁকরে, নাক টেনে, ভাঙা ভাঙা স্বরে বলে, ‘এই বড্ড গোলমাল হচ্ছে, কে কোথায় শুনতে পাবে, প্যায়দা এসে বনে সেঁদিয়েছে, সে কথা ভুললে চলবে কেন?’

প্যায়দার কথা শুনে সোনা-টিয়ার হাসি পায়, কান্না থেমে যায়। প্যায়দা আসবে কী

করে, সে তো এখন বাঘের ফাঁদে পড়ে চেল্লাচ্ছে! কিন্তু সে-কথা কাউকে বলা যায় না, যদি কেউ প্যায়দাকে তুলে আনে, প্যায়দা যদি ঘড়িওলাকে ধরে ফেলে, ঘড়িওলা ধরা পড়ে যদি মাকুর কথা প্যায়দাকে বলে। তাই সোনা-টিয়া দুহাত দিয়ে এ-ওর মুখ চেপে চুপ করে রইল।

জাদুকর প্রথম কথা বলল। ঘড়িওলাকে বলল, ‘কোথায় তোমার মাকু? তাকে পেলে জানোয়ারদের বাদ দিয়েই খেলা দেখানো যায়। নইলে তিন-গাঁ লোক আগাম টিকিট কেটে রেখেছে, এসে, খেলা দেখতে না পেলে, আমাদের মাটিতে বিছিয়ে দেবে যে!’

‘ঘড়িওলা ফোঁত ফোঁত করে কাঁদতে লাগল। হোটেলের মালিক বলল, ‘সে পালিয়ে গেছে!’

জাদুকর জানতে চাইল, কেন, পালাল কেন?

—‘ঘড়িওলাকে খুঁজতে গেছে। তার কাঁদার কল চাই।’

---‘তুমিই হলে নষ্টের গোড়া, তোমার পরিদের রানির খেলা দেখে মাকু বলে, ‘‘আমার সঙ্গে ওর বিয়ে দাও।’’ সবাই

বললে, “তুমি কলের পুতুল, হাসতে জানো না, কাঁদতে জানো না, তোমার সঙ্গে আবার বিয়ে কী! সেই ইস্তক দিনরাত ঘড়িওলার কানের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যান ‘হাসতে একটু একটু পারি, কিন্তু কাঁদার কলটা দিতেই হবে।’ এদিকে ঘড়িওলার বিদ্যে ফুরিয়ে গেছে, কাঁদার কল দেয় কী করে? তা মাকু এমনি নাছোড়বান্দা যে শেষপর্যন্ত না পালিয়ে ও বেচারা করে কী? তাছাড়া ঘড়ির দোকানের মালিক ওর নামে নালিশ করেছে, ধরা পড়লে জেলে পুরবে।”

এই বলে হোটেলওলা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

জাদুকর বললে, ‘কী জ্বালা, এই সামান্য কারণে মাকু পালাল? আরে আমাকে বললে

তো একদিন কেন, রোজ পরিদের রানির সঙেগ ওর বিয়ে দিতাম। কলের মানুষের সঙেগ মহা ধুমধাম করে রোজ পরিদের রানির বিয়ে হতো, কাতারে কাতারে লোক দেখতে আসত, ঝমঝম করে টাকার রাশি ঝরে পড়ত, শুধু ঘড়িওলার কেন, আমাদের সার্কাস পার্টিরও সব ধার শোধ হয়ে যেত, তাহলে আমাদের মালিকরা —যাক গে, এখন মাকুকে খুঁজে বের করা হোক তাহলে।'

ঘড়িওলা বলল, 'আমার ভয় করে, আবার ছেঁকে ধরবে, কাঁদার কল দাও শিগগির!'

জাদুকর বললে, 'কী জ্বালা! বলছি, ওকে কাঁদতে হবে না, এমনি বিয়ে দেব।

টিয়া বলল, 'তা ছাড়া দিদি ওর কাঁদার কল বানিয়ে দেবে বলেছে।'

ঘড়িওলা বিশ্বাস করতে চায় না। ‘সত্যি দেবে সোনা, কী করে দেবে, কীই-বা জানো তুমি?

সোনা বুক ফুলিয়ে বলল, ‘কেন, আমি যোগ-বিয়োগ জানি, ছোটো নদী, দিনরাত জানি। তাছাড়া কাঁদার কলের জিনিসপত্র সবই আমার সঙ্গে আছে।’

অমনি যে-যার উঠে পড়ল, ‘চলো, মাকুকে খুঁজে আনা যাক।’

জানোয়াররা জোলাপ খেয়ে শুয়ে থাকুক, মাকু খেলা দেখিয়ে বাজি মাত করে দেবে। হুড়মুড় করে বটতলা থেকে সবাই বেরিয়ে পড়ল, খালি হোটেলওলা এখানে-ওখানে আঁতিপাঁতি লটারির টিকিটের আধখানা খুঁজে বেড়াতে লাগল।

টিয়া তাই দেখে বলল, ‘তুমি কেঁদো না, হোটেলওলা, মাকুকে খুঁজে এনে, আমি তোমার আধখানা টিকিট খুঁজে দেবো।’

রান্নাবান্নার জোগাড়ও গাছতলায় পড়ে রইল, হোটেলওলাও মাকুর খোঁজে চলল। সোনা-টিয়ার হাত ধরে অন্য পথ ধরল।

আট

শেষ অবধি বনের ঝোপ ঝাড়ে খুঁজে খুঁজে মাকুকে পাওয়া গেল না। টিয়ার কান্না এল, দিদি,ষষ্ঠী ঠাকুরন ওকে খেয়ে ফেলেনি তো? সোনা চটে গেল, ‘তোর যা বুদ্ধি, ও কি ক্ষীর, যে খেয়ে ফেলবে, ওতো টিন আর রবার, স্প্রিং আর প্লাস্টিকের তৈরি,ওকে বাঘেও খাবে না।’

টিয়া খুশি হয়ে মুখ তুলে হাঁক দেয়, ‘ও—মাক-উ-উ-উ!’ হাঁকের চোটে পুরনো বিশাল বনের গাছের গায়ে ঝোলা দাড়ি-গোফেঁর মতো আগাছাগুলো দুলতে থাকে। সোনা-টিয়া অবাক হয়ে দেখে।

কোথায় যে গা ঢাকা দিল মাকু তার ঠিক নেই। বনের মধ্যে কত সব লুকোবার জায়গা দেখে সোনা-টিয়া অবাক হয়। নোনো এখানে এলে কী খুশিই যে হতো, ল্যাজ নেড়ে খেউ খেউ করে একাকার করত। এক জায়গায় গোল হয়ে ঝোপ গজিয়েছে, তাতে কী সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট হলুদ রঙের ফুল ফুটেছে, সুগন্ধ চারিদিকে ভুরভুর করছে, গাছের সারা গায়ে বেঁটে বেঁটে কাঁটা। তবু তারই মধ্যে কোনোমতে ঠেলেঠুলে ভিতরে ঢুকে,

সোনা-টিয়া অবাক হয়ে দেখে, মাঝখানটা একেবারে ফাঁকা, কচি নরম দুর্বোঘাসে ঢাকা, তারই মধ্যে লাল লাল চোখ, সাদা ধবধবে মা-খরগোশ, দুটো সাদা তুলোর গোছের মতো বাচ্চা নিয়ে ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে

থরথর করে কাঁপছে। আম্মা একবার বলেছিল, ওর একটা উড়নচড়ে ছেলে আছে, তার নাম রঙা , সে নাকি খরগোশ ধরে বাজারে বিক্রি করে অনেক পয়সা রোজগার করে। খরগোশেরা নাকি খুব বোকা, তাই সহজেই ধরা পড়ে। খরগোশ খেতে নাকি খুব ভালো, তাই লোকেরা কেনে। সোনার গলায় একটু ব্যথা করে।

টিয়া বললে, 'দিদি ওদের কী নাম দিবি?' সোনা ঠোঁটের উপর আঙুল দিয়ে টিয়াকে চুপ করতে বলল, তারপর জোরে ঠেলে দিয়ে ঝোপ থেকে বের করে আনল, কাঁটা লেগে সোনার হাতের এতখানি ছড়ে গেল, সোনা রক্তটা চুষে ফেলে বলল, 'বড্ড ভয় পেয়েছে। ভেবেছে ওকে মারব, ওর বাচ্চাদের নিয়ে নেব।'

সোনার নীচের ঠোঁটটা একটু কাঁপল, টিয়া তাই-না দেখেই অমনি ভ্যাঁ—অ্যাঁ! সোনা ওর দিকে একবার দেখে নিয়ে জোরে ডাকল, 'মাকু—উ—উ—উ, মা—আ—আ—কু, আর কোনো ভয় নেই রে—এ—এ।'

টিয়াও চ্যাঁচাতে লাগল— 'ও মাকু আয় রে---এ---এ! কেউ কিছু বলবে না—আ—আ।'

তাই শুনে রোগা একটা ন্যাড়া গাছ থেকে কে যেন বললে, 'ঠিক ঠিক ঠিক।' সোনার চেয়ে দেখে বিরাট একটা টিকটিকির মতো জানোয়ার, গোল চোখে, এবড়োখেবড়ো গা, পিঠে মাছের পাখনার মতো ডানি, গাছের সঙ্গে গায়ের রং মিলিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে আছে, গলায় কাছটা ধুকধুক করছে। তার

সামনে, বেশ খানিকটা দূরে, খুদে একটা সুন্দর ফিকে বেগনি প্রজাপতি এসে বসল, সঙ্গে সঙ্গে সড়াৎ করে লম্বা জিভ বেরিয়ে প্রজাপতি উদরস্থ!

সোনা-টিয়া চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল। পথের ধারে প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে মস্ত কালো কোটর, তার মধ্যে উঁকি মারতেই বেজির মতো একটা লম্বা জানোয়ার, লোমওয়ালা মস্ত ল্যাজটা সোজা রেখে সাঁ করে বেরিয়ে গাছগাছালির মধ্যে মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেল, সোনা-টিয়া দেখলে কোটরের তলাটা পাখির ডিমের খোলায় ভরতি। টিয়া একটা তুলে নিল। মাথার উপরে তাকিয়ে সোনা দেখে লম্বা একটা খাড়া সুড়ঙ্গের মতো, তাতে থেকে

এক জোড়া করে গোল চোখ গুলগুল করে জ্বলছে। সোনা-টিয়াকে কোটর থেকে টেনে বের করে আনল। টিয়ার হাতের ডিমের খোলাটার কেমন কচি সোনালি রং, তাতে খয়েরি রঙের ফুটকি দেওয়া। সোনা বলল, 'পুঁটলিতে তোর রং পানের কৌটোতে রেখে দে, নইলে ভেঙে যাবে।'

টিয়া বললে, 'মোটেই আমার কৌটো নয়, ঠামুর। তাহলে পানগুলো কোথায় রাখি?'

সোনা বললে, 'দে খেয়ে ফেলি দু-জনে, খিদে পেয়েছে। সকালে ডিম রুটি খাইনি।'

টিয়া বললে, 'আম্মা আমার ডিমে নুন গোলমরিচ দিয়ে দেয়নি।' বলে আবার খানিকটা কেঁদে নিল। সোনা কোনো কথা না বলে টিয়ার মুখে একটা মিষ্টি পান গুঁজে দিল

আর কাঁদা হল না। দুটো বড়ো পান খেয়ে দু-জনার পেট ভরে গেল, টিয়ার ফ্রকের সামনে খানিকটা লাল ঝোল লেগে গেল, টিয়া সেটাতে হাত দিয়ে ঘষে বললে, 'কিছুই হবে না, মাকু নতুন জামা কিনে দিয়েছি, আজ মালিকের জন্মদিনে সেটা পরব, না দিদি?'

সোনা বললে, 'কিন্তু মাকুকে না পেলে কী করে সার্কাস পার্টির খেলা হবে? জানোয়াররা যে সবাই জোলাপ খেয়ে শুয়ে পড়েছে!'

টিয়া হঠাৎ খুব জোরে হাঁক দিল--- 'মা---কু---উ---উ!' অমনি দেখে সামনে মাকু! দু-জনাতে ছুটে গিয়ে ওর দু-হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বকতে লাগল, 'কোথায় গিয়েছিলে মাকু? আজ রাতে যে তোমাকে খেল দেখাতে হবে, জানোয়াররা জোলাপ

খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে!' শুনে মাকু যেন আকাশ থেকে পড়ল! 'খেল দেখাতে হবে আবার কী? কীসের খেল?'

সোনা রেগে গেল। 'কীসের খেল আবার মাকু? সার্কাসের খেল, যার জন্য ঘড়িওলা তোমাকে বানিয়েছে, সেই খেল।'

মাকু একটা পুরনো উইঢিপির উপর বসে পড়ে বলল,'আমাকে ঘড়িওলা বানিয়েছে নাকি? কী দিয়ে বানাল?'

সোনা বললে, 'সব ভুলে যাচ্ছ নাকি মাকু? তাহলে নিশ্চয় তোমার চাবি ফুরিয়ে এসেছে। তুমিও যদি হাত-পা এলিয়ে পড়ে যাও, তাহলে কী হবে? না,না, মাকু লক্ষ্মী ছেলে, নাচবে, গাইবে, অঙ্ক কষবে, সাইকেল চালাবে, পেরেক ঠুকবে, না মাকু?'

মাকু বললে ‘ওসব করতে পারব না।’

সোনা বললে, ‘জানো, জাদুকর পরিদের রানিকে ফাঁস দিয়ে নামাবে, আমরা তার সাদা পোশাক দেখে এসেছি, তাতে চাঁদ তারা দেওয়া।’

মাকু বললে, ‘কিচ্ছু করতে পারব না।’

টিয়াও রেগে গেল, ‘নিশ্চয় পারবে। তোমার পেটে ঘড়ির কল বসানো আছে-না?’

মাকু বললে, ‘না, মোটেই না।’

সোনা বোঝাতে লাগল, ‘কেমন কাঁদার কল বসিয়ে দেব তোমার মাথায়, পরিদের রানির সঙ্গে বিয়ে হবে, না মাকু?’

মাকু হঠাৎ পেছনে ফিরে চোঁ-চোঁ দৌড় মারল। কত ডাকল সোনা-টিয়া, কত কাঁদল, তবু মাকু ফিরে এল না। তখন চোখ মুছে

সোনা বলল, ‘আয়, টিয়া, আমাদের নাচ-গানটা ভালো করে তৈরি করি। মাকু না করলে তো বয়ে গেল।’

বনের মধ্যে গাছের নীচে দু-জনায় ময়লা জামা পরে নাচতে গাইতে লাগল, গাছ থেকে টুপটাপ সাদা ফুল পড়তে লাগল, সোনা-টিয়া সেগুলোকে চুলের মধ্যে কানের পেছনে গুঁজে রাখল। কোথা থেকে এক জোড়া সবুজ পায়রা উড়ে এসে গাছের ডালে বসে বললে, বাকুম্ বাকুম্! পাতার আড়াল থেকে কাঠঠোকরার ঠুনুন্ন ঠুনুন্ন করে তাল দিতে লাগল, ঝোপের পাশে বনময়ূর এসে পেখম ধরে নাচ জমাল।

টিয়া গান থামিয়ে বলল, ‘ময়ূর নেচো না, শেষটা যদি বৃষ্টি পড়ে, তা হলে বটতলার উনুন নিববে, ঘাসজমিতে খেলা বন্ধ হবে।’

টিয়ার বোকামি দেখে সোনা অবাক। 'জন্তুরাও যদি খেলা না দেখায়, মাকুও যদি পালিয়ে যায়, তাহলে মালিক বেচারার জন্মদিনের সার্কাস হবে কী করে? তবে মাকুর চাবি ফুরিয়ে গেলেই মাকু এলিয়ে পড়বে, তখন ঘড়িওলার কাছে দিয়ে দিলেই হবে! ঘড়িওলা ওকে বানিয়েছে, ও তো কলের মানুষ, কলের মানুষেরা কথা শোনে।'

টিয়া বললে, 'মোটেই শোনে না; তাই তো মাকু ঘড়িওলাকে খুঁজে বেড়ায়। দিদি, মামনি বাপি কেন আসছে না?'

সোনার বুকটাও ধড়াস করে উঠল। কাল রাতে ওরা বাড়ি যায়নি, নিজেদের খাবার খায়নি, নিজেদের বিছানায় শোয়নি, কাপড়

ছাড়েনি, তবু কেউ খুঁজতে এল না, এটা কী করে হলো?

টিয়া বলল, 'বাড়ি চল দিদি।'

সোনা জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে, 'সং বলেছে জাদুকর আমাদের এই বড়ো প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল দেবে, সে না নিয়ে বাড়ি যাব না।'

—'সং কোথায়?'

অমনি মনে পড়ল মাকু পালিয়েছে, এবার তাহলে কী হবে? টিয়া বললে, 'কেন, আমি আমাদের ক্লাসের গানটাও গাইব', এই বলে গান ধরল— 'ছোটো শিশু মোরা—'

গান শুনেই ঝোপের মধ্যে থেকে সরসর করে বেরিয়ে এল এত বড়ো ডোরা-কাটা সাপ, কুণ্ডুলি পাকিয়ে ফণা তুলে, আস্তে

আস্তে সে দুলতে আরম্ভ করল। দেখে টিয়ার চোখ ছানাবড়া! সোনা বলল, 'আম্মা বলেছে, সাপেরা পাশ দিকে ছুটতে পারে না, মনে নেই?' এই বলে টিয়ার হাতে পাশ থেকে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে, দু-জনে দৌড় দৌড়! ওই দু-দিনে কত যে দৌড়ল দু-জনে তার ঠিক নেই!

বটতলাতে কেউ নেই। উনুনের আঁচ পড়ে এসেছে, উনুনে চাপানো দুধের কড়ার দুধ ফুটে ফুটে ঘন হয়ে এসেছে, সোনা তাতে মিছরির ঠোঙা, কিশমিশের কৌটো খালি করে দিল তারপর কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে, দু-জনে দু-মুঠো খেজুর খেয়ে, জল খেয়ে ছোটো নদীতে হাত-পা মুখ ধুয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে বটগাছে ঝোলানো ঘরে উঠে পাশাপাশি শুয়ে

সে কী ঘুম! এক কোণে হোটেলওলা কখন ওদের নতুন জামা, সাদা চুল-বাঁধার ফিতে তুলে রেখেছে ওদের চোখেও পড়ল না। গাছতলায় গামলা-ভরা ভাজা মাছ, বালতি-ভরা মশলা-মাখা মাংস, থলি-ভরা বাসমতি চাল পড়ে রইল। উনুন জ্বলে জ্বলে নিবে গেল, কেউ দেখবারও রইল না।

নয়

দুপুরে বেশি ঘুমুলে সোনার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, তাই ঘুম ভাঙতেই টিয়াকে ঠেলে জাগিয়ে দিয়ে বললে, 'মাকুকে চাই না। বিশ্রী মাকু।' বলতে বলতেই থুতনিটা কাঁপতে লাগল। টিয়াও চোখ খুলেই বললে, 'দুষ্টু মাকু! খেলা দেখাবে না, সাইকেল চালাবে না, লুচি বেলবে না, পেরেক ঠুকবে না, দড়ির

জট ছাড়াবে না, হারানো জিনিস খুঁজে দেবে না; হোটেলওলা বেচারি সঙের আধখানা লটারির টিকিট হারিয়ে ফেলেছে, তাও খুঁজে দিচ্ছে না। মাকু ভালো না, চাই না ওকে।'

দু-জনার দু-চোখ দিয়ে ঝরনার মতো জল পড়ছে, এমন সময় ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ে গাছ-ঘরের দেয়াল ঠেসে কে যেন এক রাশি জিনিস রেখে গেছে। সবার নীচে দেখা যাচ্ছে কাগজের মোড়ক খোলা দুটি ফ্রক, একটি গোলাপি আর একটি বেগনি, তার উপর গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে বিকেলের মিহি রোদ এসে পড়ে মনে হচ্ছে যেন জামার গা থেকে নরম আলো বেরুচ্ছে!

জামার উপর দু-টি সাদা রেশমের চুল-বাঁধা ফিতে; তার পাশে হলুদ কাগজে মোড়া দুটি

ছোটো প্যাকেট, তাতে পেনসিল দিয়ে লেখা— ‘ইতি, স্নেহের সং।’

প্যাকেট খুলে দেখে ও মা কী সুন্দর ছোটো ছোটো পুঁতিমুক্তো দিয়ে গাঁথা দুটি সাদা মালা!

হলদে প্যাকেটের নীচে আবার দু-টি সবুজ প্যাকেট, তাতে লেখা, ‘জন্মদিনের উপহার,

ইতি, হোটেলওলা।' ভিতরে সরু লেসের পাড়-দেওয়া ছোটো দু-টি সাদা রেশমি রুমাল। রাগ পড়ে গেল ওদের, কান্না চলে গেল, কিন্তু আনন্দের চোটে চোখ ভরে অন্য রকমের জল এল, তাতে মনে বড়ো আরাম হয়।

ঠিক সেই সময় গাছ বেয়ে জাদুকর উঠে এসে হাসিমুখে বললে, 'কত বড়ো প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল দরকার? যেগুলো হাতে আঁটে না, নাকি যেগুলো কোলে ধরে না?'

টিয়া তখুনি বলল, 'আরও বড়ো।'

সোনা বলল, 'আছে তোমার?'

জাদুকর একটু হাসল, 'নাই-বা থাকল, দোকানে গিয়ে পয়সা ফেললে থাকতে কতক্ষণ?'

টিয়া কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ‘পয়সা আছে? কই পকেট দেখি!’

জাদুকর পকেট উল্টে দেখাল তার কাছে একটা কানাকড়িও নেই। ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বলতে লাগল, ‘নেই তো হয়েছেটা কী? সাড়ে-তিন গাঁ থেকে প্রত্যেকটা লোক মালিকের জন্মদিনে খেলা দেখবে বলে টিকিট কেটেছে, স্বর্গের সুরুয়া খাইয়ে সবাইকে মালিক যে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছে। সংদের থলিতে দেড় হাজারের বেশি দশ পয়সা জমা হয়েছে। আরে ছোঃ, আমাদের আবার টাকার ভাবনা!’

সোনা বললে, ‘হ্যাঁ, তা ছাড়া জাদুকররা তো লোকদের নাক থেকে কান থেকে টাকা বের করে, মনে আছে টিয়া?’ জাদুকর একটু

বিরক্ত হয়ে গেল, ‘কী বাজে বকছ, জাদুর নিয়ম হচ্ছে জাদুকরের নিজের কাছে যত টাকা আছে, তার বেশি বের করতে পারবে না।’ শুনে ওরা তো অবাক! একটু গম্ভীর হয়ে সোনা বলল, ‘কিন্তু কী দেখতে আসবে গাঁয়ের লোকেরা?’

টিয়া হেসে ফেলল, ‘কেন, কেন আমরা নাচব গাইব, দড়াবাজির খেলা হবে, জাদুকর পরিদের রানিকে নামাবে, না জাদুকর?’

জাদুকর খুব খুশি, ‘হ্যাঁ, সেইটাই হল আসল খেলা। কই নামাক তো দেখি পরিদের রানিকে আর কেউ!’

সোনার তবু হাঁড়িমুখ, ‘কিন্তু জানোয়াররা তো কড়া জোলাপ খেয়ে শুয়ে পড়েছে আর

মাকু তো খেলা দেখাবে না।' এই বলে দু-জনে জড়াজড়ি করে এতক্ষণ ধরে চেপে রাখা কান্নায় ফেটে পড়ল। জাদুকর ভারি অপ্রস্তুত। 'ওমা, ছি, কাঁদে কেন? নিশ্চয় মাকু খেলা দেখাবে, দেখবে কত মজা! আমি একবার মাকুর খেলা দেখেছিলাম, অমনটি আর হয় না। আরে, এরা বেশি কাঁদে যে! ও হরি, তালেগোলে আসল কথাই যে ভুলে যাচ্ছিলাম, যে জন্যে আমার এখানে আসা! তোমাদের জন্য মালিকের জন্মদিনের উপহার এনেছি যে!'

এই-না বলে শূন্য থেকে খপ খপ করে গোলগাল দু-টি সাদা খরগোসের বাচ্চা ধরে দিল। লাল টুকটুকে তাদের চোখ, গলায় লাল ফিতেয় ছোটো দু-টি ঘণ্টি বাঁধা, নড়লে চড়লে

টুং টুং করে বাজে। তারা সোনা-টিয়ার কোলে বসেই, গাছঘরের মেঝেতে ছড়ানো নরম ঘাস খেতে আরম্ভ করে দিল। সোনা-টিয়া হেসে লুটোপুটি।

জাদুকর কোট পেন্টেলুন ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ বললে, 'মাকুকে পাওয়া গেছে।'

চমকে সোনা-টিয়া আরেকটু হলেই গাছঘর থেকে পড়ে যাচ্ছিল। সোনা-টিয়ার কানে কানে বলল, 'চুপ, কিছু বলবি না।'

জাদুকর তাই দেখে রেগে গেল। 'ছিঃ কানে কানে কথা বলা ভারি অসভ্যতা, তাও জানো না!'

সোনা লজ্জা পেয়ে গেল, 'আর বলব না, জাদুকর।'

খচমচ করে সিঁড়ি বেয়ে হোটেলওলা উপরে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘মাকুকে পাওয়া গেছে শুনেছ?’

সোনা-টিয়া জানতে চাইল, কে পেল, কোথায় পেল। মালিকের মুখে একটু হাসি দেখা দিল, ‘কেন, যার জিনিস সেই পেল। বাঁশ বনেতে খরগোশ ধরবার ফাঁদে আটকে বাছাধন চাবি ফুরিয়ে ফেলেছিল। কল ছাড়িয়ে কাঁধে করে তাকে কুকুরদের ঘরে রাখা হয়েছে। চাবিটা পাওয়া যাচ্ছে না, এই হয়েছে মুশকিল। যাও তো জাদুকর, জাদুবলে কিছু হয় কি না একবার দেখো দিকিনি।’

সে কিছুতেই যেতে চায় না, বলে কিনা ‘জাদু দিয়ে কেউ কখনো চাবির কল ঘুরিয়েছে বলে কেউ শুনেছো? তাহলে তো ভাবনাই

ছিল না, জাদুকরদের আর বটতলার হোটেলে আধপেটা খেয়ে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হতো না।'

শেষপর্যন্ত কোনোমতে ঠেলে-ঠুলে তাকে রওনা করে দিয়ে, হাত-পা এলিয়ে হোটেলওলা শুয়ে পড়ল। 'ব্যাপার বড়ো ঘোরালো, দিদিরা, শেষ অবধি সব করেও না আসল কাজটি পণ্ড হয়।'

সোনা বলল, 'কিন্তু চাবি ফুরুল কেন? ঘড়িওলা-না বলেছিল, পনেরো দিন চলবে?'

—'সে আর বলে লাভ নেই। ফাঁদে পড়ে বেটা নিশ্চয়ই পেল্লায় হাত-পা ছুঁড়ে, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে পনেরো দিনের চাবি একদিনেই শেষ করেছে।'

টিয়া ঢোক গিলে বলল,‘ঘড়িওলা ওকে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খুলে ফেলবে না তো?’

মালিক তো হাঁ, ‘পাগল নাকি। ও হলো গিয়ে রাগের কথা। মাকু একটি সোনার খনি। ও খনি সার্কাস পার্টিকে বড়োলোক করে দিতে পারে। মুশকিল হলো যে জানাজানি হলেই পেয়াদা এসে ঘড়িওলাকে ধরবে, মাকুর কলকব্জা যে ও না বলে নিয়েছিল।’ টিয়া ফিক করে হেসে ফেলল, ‘পেয়াদা ওকে ধরবে কী করে? তাকে তো আমরা বাঘের ফাঁদে ফেলে দিয়েছি, সে ভীষণ চ্যাঁচাচ্ছে!’

তারপর হোটেলওলাকে পেয়াদার কথা বলতে হলো, তারই মধ্যে মুখ কালো করে ঘড়িওলা এল। ‘ও দাদা, চাবির কী করা যায়? সঙেরা রং মাখিয়ে ওর চেহারা ফিরিয়ে

দিয়েছে, মেম নতুন কাপড়-চোপড় পরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ও যে নড়েও না চড়েও না, মড়ার মতো পড়েই আছে।’

তাই শুনে সোনা-টিয়া একসঙ্গে কেঁদে উঠল, ‘ও বাপি ও মামনি, মাকু মরে গেছে।’ ঘড়িওলা রেগে টং। ‘ও আবার কী কথা! মরে যাবে কেন? কলের পুতুল, আবার মরে নাকি? এমন মজবুত জিনিস দিয়ে গড়েছি, মাকু সহজে ভাঙবেও না, চাবি দিলেই কেমন জ্যান্ত হয়ে উঠবে দেখো। আছে তোমাদের পুঁটলিতে ছোটো কানখুশকি বা ওই ধরনের কিছু? আমি তো ভয়েতেই সব ছেড়েছুড়ে এসেছি।’

সোনা বললে, ‘টিয়া, মামনির কাঁচি এনেছ, কানখুশকিটা আননি?’

টিয়া মাথা নাড়ল। সোনার কী রাগ!

—'ভারি দুষ্টু মেয়ে টিয়া, মামনি কত বারণ করে তবু নখ কাটার ভালো কাঁচি এনেছে, যদি আগা ভোঁতা হয়ে যায়? আর কাঁচিই যদি আনলে তো কানখুশকিটা আনতে পারলে না, ও—ও—ও!!'

বকুনি খেয়ে টিয়া আবার একটু কাঁদল তারপর চোখ মুছে বলল, 'ছিল না ওখানে, খুঁজে পাইনি। আমি কানখুশকি বানিয়েছি, তাই দিয়ে চাবি ঘোরাব। চলো।' ঘড়িওলা আনন্দে লাফিয়ে উঠে দু-জনার হাত ধরে টানতে টানতে গাছঘরের কেঠো সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই, হোটেলওলা বলল, 'বাঃ সাজা-গোজার জিনিস নেবে না? নাচবে-গাইবে না? বেলা গেছে, এখানে আর

ফেরা হবে না, ঘাসজমিতেই সাজতে হবে, গোমেস মেমসাহেব কেমন তোমাদের সাজিয়ে দেবে দেখো। ওর হাতে জাদু আছে, পরিদের রানিকে দেখনি, কে বলবে যে একটা—'

মালিক বললে, 'এক যদি কোনোরকমে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যায়। সঙের লটারি টিকিটেরও আধখানা গেছে হারিয়ে, নইলে—' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হোটেলওলা থামল। সোনা-টিয়ার খুব কষ্ট হতে লাগল, ওরা হোটেলওলার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল! তারপর ঘড়িওলার তাড়ার চোটে সবাই ঘাসজমির দিকে রওনা দিল। কড়াইভরা ঘন দুধের পায়েস, কাঁচা হরিণের মাংস, ভালো ভালো সুগন্ধি চাল, কিশমিশ, বাদাম, মশলা,

হাঁড়িভরা স্বর্গের সুরুয়া বটতলাতে ঢাকা চাপা হয়ে পড়ে রইল, রাঁধাবাড়ার কথা কারো মনেও হল না।

দশ

পশ্চিম দিকে সূর্য হেলে পড়েছে, গাছের ছায়া লম্বা হয়েছে, এমন সময় বনের মধ্য দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়, ঘড়িওলা খেপল নাকি? ঘড়িওলা টিয়ার হাত আর হোটেলওলা অন্য হাত ধরে এমনি ছুট দিল যে মাটি থেকে টিয়ার পা দুটো এক হাত শূন্যে ঝুলতে লাগল, চ্যাংদোলা হয়ে টিয়া চলল; সোনাও পাঁইপাঁই পা চালাতে লাগল।

ঝুলতে ঝুলতে টিয়া হাসি হাসি মুখ করে বলতে লাগল, 'কোনো ভয় নেই, আমি

মাকুকে চাবি লাগিয়ে দেবো, আমি মাকুর জন্য চাবি বানিয়েছি, পুঁটলিতে আছে।’

ঘড়িওলা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘কী দিয়ে বানিয়েছ শুনি?’

—‘কেন, জিনিস দিয়ে। দিদির পুঁটলিতেও জিনিস আছে, দিদি তাই দিয়ে কাঁদার কল বানাবে, না দিদি?’

সোনা বললে, ‘হ্যাঁ। তাহলে মাকু কাঁদবে; জাদুকর রোজ পরিদের রানির সঙ্গে ওর বিয়ে দেবে বলেছে, তাই দেখে দেশের লোক ধন্য ধন্য করবে, জাদুকর বলেছে।’

—‘উঃ!’

—‘কী হলো? পায়ে কী ফুটল?’

হোটেলওলা থমকে দাঁড়িয়ে ঘড়িওলাকে বলল, ‘তোর কোনো আক্কেল নেই, অত যে ছুটছিস্, ওরা কত ছোটো ভুলে যাচ্ছিস কেন?’

সোনা বললে, ‘না, না, না, আমরা বড়ো হয়েছি, স্কুলে ভরতি হয়েছি, আমরা দৌড়োতে পারি; চলো তাড়াতাড়ি চলো, নইলে মাকু যদি সত্যি মরে যায়!’

টিয়া ঝুলতে ঝুলতে বলল, ‘হ্যাঁ, আমরা খুব দৌড়োতে পারি; মাকু যদি মরে যায়?’

ঘড়িওলা হাসল, ‘কলের পুতুল আবার মরে নাকি? মরলেও চাবি দিলেই আবার জিন্দা হবে। ও টিয়া, সত্যি করে চাবি দিতে পারবে তো?’

টিয়া হঠাৎ হাত ছেড়ে নেমে পড়ে দৌড়োতে লাগল, দেব, দেব, ঠিক দেব?'

ঘাসজমির যতই কাছে আসা যায় চাপা গোলমাল শোনা যায়; বাদ্যকররা ট্যাম কুড় কুড় করে বাজনা অভ্যাস করছে, কিন্তু কারো মনে ফুর্তি নেই। কুকুরদের ছাউনির বাইরে তেলো হাঁড়ির মতো মুখ করে সবাই দাঁড়িয়ে। বড়ো মেম চোখে রুমাল দিয়ে গাছের গুঁড়ির উপরে সাদা জুতো মোজা পায়ে দিয়ে বসে আছে; চোখের মুখের রং লেগে রুমালে লাল-কালো ছোপ ধরেছে।

ছাউনির তলায় আলো কম, তাই বড়ো ডে-লাইট বাতি জ্বালা হয়েছে, তারই নীচে ময়লা শতরঞ্চির উপর হাত-পা এলিয়ে মাকু পড়ে আছে। তার দিকে তাকানো যায় না।

তাকে চেনা যায় না। এই কি সেই সুন্দর মাকু? একটু আগেও কত কথা বলেছে, ধুপধাপ করে জঙ্গলের মধ্যে কেমন হেঁটেছে আর এখন ময়লা শতরঞ্চিতে হাত-পা টান করে, চক্ষু মুদে পড়ে আছে! চেহারাটাই বদলে গেছে, কী শক্ত কাঠ কাঠ হাত-পা। এরই মধ্যে মাকুর এ কী হাল হলো, দেখলেই কান্না পায়। তার উপর নাকে-মুখে-চোখে রং দেবার লোকেরা তুলি বুলিয়েছে, কী দিয়ে তাকে চেনা যাবে? নাকের কালো তিলটা জ্বলজ্বল করছে, আরও বড়ো দেখাচ্ছে। ঘড়িওলা হাঁটু গেড়ে পাশে বসে পড়ে বললে, 'ওই তিলের নীচে টেপা কল আছে; আগে চাবি দিয়ে, তারপর কল টিপলে, তবে মাকু চলবে ফিরবে, কথা কইবে, কাজ করবে। কই টিয়া দিদি, তোমার

চাবি দেবার যন্ত্রখানি এবার বের করো দিকিনি! আমার মাকুর দিকে তাকালে যে চোখে জল আসে।'

সোনার বুক টিপটিপ করে; টিয়ার কাছে যদি চাবি না থাকে? চাবি দিয়ে কল টিপলেও যদি মাকু উঠে না বসে, চোখ না খোলে? পুঁটলি হাতে করে তড়বড়িয়ে টিয়া গিয়ে মাকুর মাথার কাছে উবু হয়ে বসল।

—'কই, চাবির ছ্যাঁদা কই?'

ঘড়িওলা, সং, জাদুকর, আরও দু-জন ষণ্ডা লোক, মিলে হেঁইও হেঁইও করে মাকুকে উপুড় করে দিল। মাটির উপর ধড়াম করে শব্দ হল, কী ভারী রে বাবা! নতুন কোট শার্ট আঁটো করে পরা; যত্ন করে ঘড়িওলা গলার বোতাম

খুলে, জামাগুলো ঢিলে করে, ঘাড়টাকে খালি করে দিল।

ঘাড়ের নীচে, দুই ডানির মাঝখানে, ছোটো গোল একটা গোলাপি কাঠি বের করে, তার মাথাটাকে ছ্যাঁদায় ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে পাক দিতে লাগল।

ঘড়িওলা মাথা বাগিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'দাও, দাও, আমাকে দাও, তুমি পারবে না।'

টিয়া কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ঘড়িওলাকে সরিয়ে চাবি ঘোরাতে লাগল, বলল, 'আমি দু-শো অবধি গুণতে পারি।'

ঘড়িওলা খুশি হয়ে গেল। 'এমন কল আর কেউ করুক তো দেখি; চলে ফেরে, কথা বলে, সাইকেল চালায়, পেরেক ঠোকে; অথচ

ছোটো মেয়ের হাতেও মাখনের মতো চলে।’ টিয়া মুখ তুলে বলল, ‘আমরা বড়ো হয়েছি, স্কুলে ভরতি হয়েছি, আগের মতো কাঁদি না।’ হোটেলওলা শুনে অবাক, এই বুঝি কম কাঁদা, তাহলে আগে না জানি কী ছিল!

যখন চাবি আর ঘোরে না, টিয়া ঘড়িওলার দিকে চাইল; আঙুলের আগা দিয়ে চেপে-চুপে দেখল, সত্যিই পুরো চাবি দেওয়া হয়েছে। সোনা হাত বাড়িয়ে টুক করে চাবিটাকে ছ্যাঁদা থেকে বের করে নিয়ে ভালো করে দেখতে যাবে, এমন সময় টিয়া ছোঁ মেরে সেটাকে নিয়ে আবার পুঁটলির মধ্যে গুঁজে রাখল।

এবার মাকুকে চিত করা হলো। চেহারা এখনও যেমনকে তেমন, দেখে চেনা যায় না,

বেচারা মাকু। সোনা আস্তে আস্তে ওর কালো বুট পরা পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল; কী কেঠো-পা! সোনার কান্না আসছিল। টিয়ার সবটাতেই সর্দারি, ঘড়িওলা কিছু বলবার আগেই পুট করে নাকের টিপকলটা টিপে দিল।

অমনি মাকুর মাথার মধ্যে থেকে, বেড়ালরা খুশি হয়ে গলা থেকে যে রকম শব্দ বের করে, সেই রকম খ-র্-র্-র্-খ-র্-র্-র্ শব্দ হতে লাগল। চোখের পাতা কেঁপে উঠল, হাত-পা নড়ল, মাকু উঠে বসল। টিয়া আহ্লাদে আটখানা হয়ে, 'ও মাকু' বলে মাকুকে জড়িয়ে ধরল। মাকু ওকে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। টিয়া মাটিতে পড়ল, মাথা ঠুকে গেল, কাঁদবে বলে হাঁ করেছে, এমনি সময় ঘড়িওলা গম্ভীর

গলায় ডাকল, ‘ছেলে’!

মাকু বলল, ‘বাপ!’

—‘নাম বলো।’

—‘মাকু।’

—‘দুই আর দুই-এ কত হয়?’

—‘চার।’

—‘চার থেকে তিন নিলে কত থাকে?’

—‘এক।’

—‘তাহলে একটু নাচো গাও, মাকু।’

মাকু অমনি এক হাত কোমরে দিয়ে এক হাত আকাশে উড়িয়ে, বিলিতি কায়দায় গেয়ে উঠল, ‘ইয়াঙ্কি ডুডড্‌ল ওয়েন্ট টু টাউন রাইডিং-অন্‌-এ পোনি!’ এখন টিয়ার কাঁদা হলো না, হাঁ করে দু-জনে তাকিয়ে রইল।

ঘড়িওলা বললে, ‘খুব ভালো, মাকু। এখন এই টুলে বসে বিশ্রাম করো, বেশি চাবি খরচ করে দরকার নেই। খেলা শুরু হলে আমি তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব। দেখো জাদুকর কেমন পরিদের রানিকে নামাবে।’

জাদুকর এগিয়ে এসে বলল, ‘রোজ তোমার সঙ্গে মহা ঘটা করে রানির বিয়ে দেবো, হাততালিতে আকাশ ভেঙে পড়বে। বিয়ের জিনিসপত্র সব রেডি।’ এই বলে শূন্য থেকে একটা সানাই নামিয়ে এনে জাদুকর পোঁ ধরল।

মেমের চোখের জল শুকিয়ে মুখে হাসি ফুটেছে, গালে-কপালে লাল-কালো রং লেগেছে। সে সবাইকে ডেকে বলল, ‘আর দেরি নয়, বেড়ার বাইরে লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে, মাকু রেডি, আমি মুখটা

মেরামত করলেই রেডি, তোমরাও সেজেগুজে নাও। লক্ষ্মী মেয়েরা, এসো, তোমাদের নতুন জামা পরিয়ে, মালা পরিয়ে, পাউডার মাখিয়ে, মাথার চুলে বো বেঁধে, রুমালে সেন্ট ঢেলে দিই, তোমরাও যে নাচবে গাইবে।'

সবার মুখেই হাসি ফুটল; খালি সোনা-টিয়ার মন খারাপ, চাবি ফুরিয়ে অবধি মাকু তাদের ভুলে গেছে। ওদের মুখ দেখে সঙের বড়ো কষ্ট হলো, কানে কানে বলল, 'মেলা টিকিট বিক্রি হয়েছে, মালিক তোমাদের জন্যে দুটো বড়ো বড়ো প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল কিনবে বলেছে, এখন চলো দিকিনি!'

কী সুন্দর করে মেমসাহেব ওদের সাজিয়ে দিল, সাদা করে মুখে পাউডার মেখে মাথায়

রেশমি ফিতে বেঁধে, গলায় মালা দিয়ে, সেন্ট মাখানো রুমাল নিয়ে, মাকুর কথা তখনকার মতো ওরা ভুলে গেছে।

এদিকে ঘাসজমিতে লোক ধরে না; কাতারে কাতারে সবাই বসে গেছে। দেয়াল নেই, চেয়ার নেই, গ্যালারি নেই, টিকিট দেখবার লোকও নেই, যে আসছে সেই যেখানে পারে বসে যাচ্ছে। তাদের কথাবার্তায় চারদিক গমগম করছে। ঘাসজমির মাঝখানে পুরনো শিরীষ গাছ অনেক উঁচুতে ডালপালা মেলে, প্রায় তাঁবুই বানিয়ে রেখেছে, তারই নীচে সার্কাস হবে। গুঁড়ির দু-পাশে খানিকটা জায়গা চাটাই দিয়ে আড়াল করা, তার পিছনে সার্কাস পার্টির লোকেরা সেজেগুজে অপেক্ষা করছে।

এমনি সময় রোল উঠল, 'সবই হলো, কিন্তু রিং-মাস্টার কে হবে? সবাই যদি খেলায় নামে, খেলা দেখাবেটা কে তাহলে? লিকলিক বেত হাতে মাঝখানে দাঁড়িয়ে কে চ্যাচাবে?'

সং বলল, ‘মালিক, তুমিই হও। রোজ আমাদের মশকো করিয়েছ, তোমার মতো ওস্তাদ কোথায় পাব বলো?’

এদিকে সময় হয় হয়, কিন্তু হোটেলওলা রাজি হতে চায় না। ঘড়িওলা অনেক কাকুতি-মিনতি করে শেষটা রেগে গিয়ে মালিককে দেখিয়ে মাকুকে বলল, ‘ওই ইঁদুর, ধরো।’

মাকু অমনি এক লাফে মালিককে এমনি জাপটে ধরল যে সে বেচারা প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল, ‘হব, হব, রিং-মাস্টার হব, আরে আমি কি তাই বলেছি নাকি, লজ্জাও করবে না নাকি! ওরে ব্যাটা ছেড়ে দে, কেঁদে বাঁচি!’

সবাই ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগল, ‘ওরে মাকু, ছেড়ে দে রে।’

কিন্তু কে কার কথা শোনে। শেষ অবধি ঘড়িওলা মাকুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'ছাগল ছাড়ো।' মাকু অমনি হাত নামিয়ে নিল। হোটেলওলা নিজের হাত-পা টিপে-টুপে দেখে বলল, 'উফ্, আরেকটু হলেই চিঁড়ে-চ্যাপটা হতাম! তোর মাকু তো সংঘাতিক লোক রে!'

অনেকেই ফিকফিক করে হাসতে লাগল। ঘড়িওলা বুক ফুলিয়ে বলল, হ্যাঁ, ও আমার ছাড়া কারো কথা শোনে না। মাঝে মাঝে আমারও শোনে না!'

শুনে সোনা অবাক, মাকু যখন হোটেলে কাজ করত তখন তো যে যা বলত তাই শুনত। নতুন চাবি দেবার পর হয়তো বদলে গেছে! চাবিটাই হয়তো খারাপ, টিয়া কোথায়

পেল কে জানে। মামনির দেরাজে মোটেই ওইরকম গোলাপি কাঠি ছিল না।

তারপরেই খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। মাকুকে চাটাইয়ের আড়ালে টুলের উপর ঘড়িওলা বসিয়ে রেখেছে, ওকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু ও সব দেখতে পাচ্ছে। সোনা-টিয়াও তার পিছনে দাঁড়াল। সঙের কাণ্ড দেখে ওরা হেসে বাঁচে না। একগালে চুন আর একগালে কালি মেখে, গাধার টুপি মাথায় দিয়ে, একটার পর একটা উলটো দিক দিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে আর কী সব বলছে, শুনে গাঁয়ের লোকেরা বেজায় হাসছে। দড়াবাজির ছেলেরা যখন উপরের দোলনা থেকে লাফিয়ে নীচে নামছিল, সং তখন নীচে

থেকে লাফিয়ে উপরের দোলনায় উঠতে চেষ্টা করছিল।

গাঁয়ের লোকদের হাততালিতে কান ঝালাপালা!

চাটাইয়ের বেড়ার মাঝখানে ঢুকবার পথ, তাতে মস্ত নীল মখমলের ছেঁড়া পর্দা ঝুলছে; এক পাশে মাচা বেঁধে বাজনাদাররা বসেছে; গাছের ডাল থেকে একটা প্রকাণ্ড বড়ো ডে-লাইট বাতি ঝুলছে, তা ছাড়া ছোটো দুটোও আছে।'

দড়ির বাজি শেষ হলো।

এবার সোনা-টিয়ার পালা; সবাই মিলে নীল পর্দার তলা দিয়ে ঠেলেঠুলে ওদের দর্শকদের সামনে বের করে দিল। সং অমনি

সেলাম ঠুকে একপাশে গিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়াল। সবাই হাসতে লাগল।

এত দর্শক দেখে ভয়ের চোটে সোনার হাত-পা ঠান্ডা, গলা শুকিয়ে কাঠকয়লা! টিয়ার এতটুকু ভয় নেই, সোনার হাত ধরে টেনে মাঝখানের বড়ো আলোর নীচে দাঁড়িয়ে একটা নমস্কার করেই হাত মেলে গান জুড়ে দিল, 'ফুল কলি আসে অলি গুন্ গুন্ গুঞ্জনে!' অমনি সোনার ভয় দূর হয়ে গেল, আলোর নীচে দুই বোনে নাচতে গাইতে লাগল আর গাছের উপর থেকে দড়াবাজির ছেলেরা লুকিয়ে বসে, ছোটো ছোটো সাদা ফুলের বৃষ্টি করতে লাগল। গাঁয়ের লোকদের মুখে আর হাসি ধরে না।

গান শেষ হলে সং পর পর পাঁচটা ডিগবাজি খেয়ে, নীচে থেকে এক লাফে সত্যি সত্যি বড়ো দোলনায় উঠে পড়ে, দুটো বড়ো বড়ো করতাল দিয়ে হাততালি দিতে লাগল।

দর্শকরাও তাই দেখে দ্বিগুণ জোরে হাততালি দিল। সোনা-টিয়া লজ্জা পেয়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইল।

হোটেলওলা আজ রিং-মাস্টার হয়েছে, সে দু-জনার পিঠে দুই-হাত রেখে তাদের কত প্রশংসা করল। তারপর আরও দু-একটা খেলার পর ঘড়িওলা মাকুকে নিয়ে আলোর নীচে দাঁড়াল। সোনা-টিয়া অবাক হয়ে দেখল মাকুর হাঁটা পর্যন্ত বদলে গেছে। মালিক তখন সেই পুরোনো গোলাপি হ্যান্ডবিলটা বের করে

পড়তে লাগল আর দর্শকরা অমনি অবাক হয়ে গেল যে কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

এদিকে সঙের দলের ছেলেরা গাছতলায় টপাটপ কত জিনিস যে এনে ফেলল তার ঠিক নেই। ঘড়িওলা মাকুকে যা বলে, সেও তাই করতে লাগল, সেও এক দেখবার জিনিস। নাচল, গাইল, কাঠের বাক্সে পেরেক ঠুকল, মোড়লের সাইকেল চালাল, ভাঙা টাইপরাইটার দিয়ে ইংরিজিতে চিঠি লিখল, ঘড়িওলার সঙ্গে কুস্তি করল। দেখে দেখে সবার থুতনি ঝুলে পড়ল। অথচ চাকর সেজে যখন মাকু লুকিয়েছিল, এর চেয়েও কত বেশি কাজ করেছে, কলের পুতুল বলে চেনা যায়নি, তবু কেউ হাততালি দেয়নি। এখন মানুষের মতো কাজ করে বটে, কিন্তু খটখট করে চলে,

ক্যান ক্যান করে কথা বলে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে মজার মুখ করে না।

শেষটা মাকুর খেলা শেষ করে তাকে নিয়ে ঘড়িওলা যেই চলে যাচ্ছে, সবাই মিলে বেজায় চ্যাঁচাতে লাগল, 'মাকু-মাকু, মাকু! আরও খেলা দেখব।' ঠিক সেই সময়ে দলবল নিয়ে জাদুকর ঢুকে পড়ে, চোখে চোঙা লাগিয়ে চিৎকার করে বলল, 'মাকুর খেলা এখনও শেষ হয়নি, একটু ধৈর্য ধরে চুপ করে বসুন, নইলে কল বিগড়ে যাবে।'

অমনি সবাই চুপ।

সোনা-টিয়া ততক্ষণে তাদের পালা শেষ করে, দর্শকদের সকলের সামনে ঘাসের উপর পা মেলে বসে খেলা দেখছিল। সোনা

ফিসফিস করে বলল, ‘মাকুকে দেখে জাদুকরের বোধ হয় হিংসে হচ্ছে।’

টিয়া জানতে চাইল, ‘হিংসে কী দিদি?’

সোনা রেগে গেল, ‘তাও জানিস না? বোকা!’

টিয়া বলল, ‘মোটেই বোকা না। সব জানি। পিসির খোকাকে হিংসে, আম্মা বলেছে।’

অনেকক্ষণ খেলা চলেছে, রাত হয়ে এসেছে, চারিদিকে অন্ধকার, কিন্তু ঘাসজমিতে আলোয় আলোময়। দূরের ছাউনিতে জানোয়াররা অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছে, সারাদিনের পর আবার খেয়েছে, কুকুররা ডাকছে, মাঝে মাঝে ঘোড়াদের পা ঠোকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এমনকী

জাদুকরের শাকরেদ এরই মধ্যে কখন গিয়ে ডবল ঘোড়া সাজিয়ে এনেছে। জাদুকর তাদের পিঠে মগডাল থেকে পরিদের রানিকে নামাল।

তার রূপ দেখে গাঁয়ের লোকের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল, তারা বার বার নমস্কার করতে লাগল। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের বলতে লাগল, 'ওরে গড় কর, গড় কর, আকাশ থেকে পরি এসেছে, আর আমাদের কোনো দুঃখুই থাকবে না।'

তাদের দেখাদেখি সোনা-টিয়াও একবার ঠুক করে মাটিতে মাথা ঠুকে গড় করে নিল। ওদের কপালে এক টিপ করে ধুলো লেগে রইল, কেউ লক্ষই করল না। সবাই মাকুর গুণপনা দেখতে ব্যস্ত। পরিদের রানি নামতেই মাকু গিয়ে অধিকারীর কাছে হাজির। ঘড়িওলা তার কাছে গিয়ে কী যেন বলল, অমনি মাকু বাজনার সঙ্গে তাল রেখে নাচতে শুরু করে

দিল। লোকেদের আনন্দ দেখে কে, তাদের বাহবাতে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়।

গাছের ডালপালার ভেতর থেকে ছেলেরা রাশি রাশি লাল হলুদ ফুল ফেলতে লাগল। পরিদের রানির খেলা শেষ হলো, তাকে পিঠে নিয়েই দুই ঘোড়া বড়ো আলোর নীচে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। পরিদের রানিকে অধিকারী হাত ধরে নামাল। মাকুরও নাচ থেমেছে, ঘড়িওলা তাকে রানির সামনে দাঁড় করাল। সং বেতের ঝুড়িতে দু-গাছি মোটা গোড়ে-মালা আর বরের মাথার টোপর এনে দাঁড়াল।

জোরে জোরে বাজনা বাজতে লাগল, থোপা থোপা ফুল পড়তে লাগল। এইরকম মহা ধুমধামের সঙ্গে মাকুর আর পরিদের

রানির বিয়ে হয়ে গেল। আনন্দের চোটে দর্শকদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, সোনা-টিয়াও নতুন জামার কোনা দিয়ে ঘনঘন চোখ মুছতে লাগল, তেমনি আবার হেসে হেসে গালে ব্যথা ধরে গেল।

খেলা শেষ হয়ে গেল, তবুও লোকেরা বাড়ি যেতে চায় না। ঘড়িওলা বড়ো আলোর নীচে দাঁড়িয়ে মুখে চোঙা লাগিয়ে, সবাইকে বলল, 'আজ আমাদের প্রিয় অধিকারীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে খেলা এইখানে শেষ হলো। আপনারা সকলে সাধু সাধু বলুন।'

তখন সে কী আকাশ-ফাটানো সাধুবাদ, চারদিকের জঙ্গল থেকে গমগম করে প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল।

মালিককে ঠেলতে ঠেলতে সং বড়ো আলোর নীচে নিয়ে এল, লজ্জায় তার গাল পাকা আমের মতো লাল হয়ে উঠেছে, দাড়ি-গোঁফ এক বিঘত ঝুলে পড়েছে, সিন্ধুঘোটকের মতো দেখাচ্ছে। তাকে দেখেই যে যা পারে ছুঁড়ে দিতে লাগল ফুল, ফল, লাঠি, ছাতা, মাথায় দেবার টোকা, বাতাসার ঠোঙা, রুমাল, গামছা, পয়সা, সিকি। মালিকের গাল বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগল, একটা কথাও বলতে পারল না।

শেষপর্যন্ত বুদ্ধি করে দড়ি টেনে দিয়ে জাদুকর বড়ো আলো নিবিয়ে দিল, অগত্যা লোকেরা বাড়ির পথ ধরল। তখন যে যেখানে ছিল, ক্লান্ত হয়ে ধপাধপ বসে পড়ল, ঘড়িওলা মাকুকে টেনে বসাল। টিমটিম করে দু-ধারে

দু-টি লম্প জ্বলছে, ছায়ার মতো সবাই পা ছড়িয়ে বসে, কারো মুখে কথা নেই, চারদিকে পয়সাকড়ি, জিনিসপত্র ছড়ানো। আবছায়াতে সঙের দল জিনিসপত্র পয়সা কুড়িয়ে মালিকের পাশে জমা করতে লাগল। এসব সে-ই পাবে। আজ তার জন্মদিন।

এগারো

কারো মুখে কথা নেই, বসে আছে তো বসেই আছে, টিয়া একটু একটু পা নাচাচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে ঘড়িওলা উঠে আবার বড়ো আলোটাকে জ্বেলে দিয়ে সোনাকে বলল, 'তাহলে এবার তোমার কথা রাখো। মাকুকে কাঁদার কল দাও। রোজ ওর বিয়ে দেওয়া হবে, কাঁদার কল নইলে চলবে কেন।'

মাকুর মুখটা অমনি একটু খুশিখুশি মনে হলো।

সোনা তার কাছে এসে ঘড়িওলাকে বলল, 'চাঁদি খোলো।'

ঘড়িওলা মাকুর নাকের কল টিপে দিল। অমনি মস্ত একটা হাই তুলে মাকু ঘুমিয়ে কাদা। ঘড়িওলা মহাখুশি হয়ে ওর দু-কান ধরে কষে প্যাঁচালো। অমনি সুন্দর লালচে কোঁকড়া চুলসুদ্ধ মাথার খুলি কট করে বাক্সের ঢাকনির মতো খুলে গেল। সবাই দেখল ভিতরের কলকব্জার মাঝে মাঝে ফাঁকা রয়েছে।

সোনা বললে, 'জল আনো।'

ততক্ষণে যে যার জায়গা ছেড়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, টিয়া ঠেলেঠুলে একেবারে ঘড়িওলার কোলে চেপেছে।

হোটেলওলা নিজের জলের গেলাস দিল।

সোনা পুঁটলি খুলে ফুটো জ্যামের টিন, কেরোসিন তেল ঢালবার ফোঁদল আর বাপির কাজের ঘর থেকে আনা রবারের নল বের করল।

তারপর কলকব্জার ফাঁকে সবচেয়ে উপরে জ্যামের টিন বসিয়ে, তার তলায় ফোঁদল দিয়ে তার মুখে রবারের নল লাগিয়ে, নলের অন্য দিকটাকে মাকুর মুণ্ডুর ভিতরে দুই চোখের মাঝখানে গুঁজে দিল। তারপর গেলাসের জলটুকু টিনে ঢেলে, পট করে খুলির ঢাকনি বন্ধ করেই, মাকুর নাকের টিপকল টিপে দিল।

অমনি ঘুম ভেঙে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে মাকুও কেঁদে ভাসিয়ে দিল। দু-চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে তো পড়ছেই; গালের

নতুন লাগানো লাল রং ধুয়ে গড়াচ্ছে; শার্টের বুক, কোটের কলার ভিজে সপসপ করছে। যতক্ষণ না জ্যামের টিনের তলার ফুটো দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে সব জল বেরিয়ে টিন খালি হয়ে গেল, ততক্ষণ মাকুর কান্না আর থামে না। একসঙ্গে এত বেশি কাঁদতে কাউকে বড়ো-একটা দেখা যায় না, সকলে সোনাকে 'সাধু সাধু' বলতে লাগল। এত কাঁদতে পেরে মাকুও আনন্দের চোটে হেসে ফেলল। ফুর্তির চোটে মালিকের দাড়ি খামচে এক লাফে যেই মাকু উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে মালিকের দাড়িগোঁফও হ্যাঁচকা টানে খুলে গিয়ে, মাকুর হাতে ঝুলে থাকল।

একেবারে থ হয়ে এক সেকেন্ড উপস্থিত সকলে মালিকের চাঁচাছোলা ন্যাড়া মুখের

দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, তারপর ‘ওই ওই ওই আমাদের পালানো নোটো মাস্টার। হোটেলের মালিক সেজে এতকাল আমাদের মাঝখানেই লুকিয়ে ছিল গো। ও মাস্টার, বলি আমরা তোমার জন্যই হেদিয়ে মরছিলাম আর তুমি কি না ভোল বদলে এইখানেই ছিলো গো!’

সবাই মিলে একসঙ্গে মালিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেউ তার হাত ধরে নাড়ে, কেউ পায়ের ধুলো মাথায় নেয় আর মেম তাঁর দুই গালে দুটো চুমু খেল। যারা যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের সবার চোখে জল এসে গেল।

মালিক একসঙ্গে হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, ‘ওরে, সত্যিই আমি

তোদের সেই পালানো নোটো অধিকারী রে! জিনিস কিনে দাম না দিয়ে, তোদের সবাইকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিলাম আর তোদের পেছনেই পেয়াদা লাগল। তাই ভেবে দুঃখ রাখবার জায়গা পাই না! তবে সুখের বিষয়, আর কোনো ভয় নাই রে। পুলিশের ভয়ে ছদ্মবেশ ধরে, এতদিন হোটেল চালিয়ে যে টাকা জমিয়েছি আর আজ যা পেলাম, তাই দিয়ে সব ধার শোধ করে, জিনিস ছাড়িয়ে, নতুন তাঁবুর তলায় আবার নতুন করে সার্কাস খুলব রে।' সবাই বললে 'সাধু! সাধু!'

ঘড়িওলা ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'তবে আরও পাঁচ হাজার টাকা হলেই হয়। তাহলে ঘড়ির কারখানায় গিয়ে, মাকুর যন্ত্রপাতির দাম চুকিয়ে ফেলি; আমারও আর

পেয়াদার ভয় থাকে না, রোজ খেলা দেখিয়ে টাকার গাদা জমাই। তারপর একদিন ছুটি নিয়ে দুই ভাই মায়ের কাছে একবার গিয়ে, পেট ভরে চাপড়ঘণ্ট, মোচা-চিংড়ি আর দুধপুলি খেয়ে আসি।'

এই বলে দুই ভাই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

সং বললে, 'কেঁদো না তোমরা, লটারি জিতলে, আমি টাকা দেবো।'

ঠিক সেই সময়ে আধময়লা বড়ো খাম হাতে গর্তে-পড়া সেই পেয়াদা এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে মাকুর হাত ধরে চাটাইয়ের পেছনে ঘড়িওলা অদৃশ্য। বাকিরা তেড়িয়া হয়ে লোকটাকে ঘেরাও করল, 'কাকে ধরতে এসেছ? মালিক কালই সব টাকা শোধ করে

জিনিস ছাড়াবে। যাও এখান থেকে।' লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

—'সে কথা তো আমি কিছু জানি না। পোস্টমাস্টারমশাই বললেন, 'বনের মধ্যে যা, ফেলারাম, সংবাবুর চিঠি এসেছে; আমি পড়ে দেখেছি উনি লটারি জিতেছেন। টিকিটটা আপিসে জমা দিলেই পাঁচ হাজার টাকা পাবেন। এই নিন চিঠি।'

একথা শোনবামাত্র সং অজ্ঞান হয়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল আর মালিক বুক চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল, 'হায় হায়, আমি যে আধখানা টিকিট হারিয়ে ফেলেছি। ওই দেখো, সঙের পকেটে শুধু আধখানা আছে। ওরে টিয়া, এত বললাম, তবু খুঁজে দিলি না তো।'

সঙের পকেট থেকে আধখানা গোলাপি টিকিটের দিকে তাকিয়েই সোনা চমকে উঠল! টিয়ার হাত থেকে পুঁটলি কেড়ে তার মধ্যে

থেকে গোলাপি চাবিকাঠি বের করে, তার বাইরের গোলাপি মোড়ক খুলে ফেলল। ভিতর থেকে মামনির সিঁদুর পরবার রুপোর কাঠি বেরিয়ে পড়ল।

গোলাপি মোড়ক মালিকের হাতে দিয়ে সোনা বলল, 'এই নাও বাকি আধখানা। টিয়া, তুমি ভয়ানক দুষ্টু। খুঁজে পেয়ে টিকিট লুকিয়েছে। আর মামনির সিঁদুরের কাঠি না বলে নিয়েছ! ও—ও!'

বকুনি খেয়ে টিয়া ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল, 'ওমা ওটা কেন টিকিট হবে? টিকিটের ধারে আঁকড়াবাঁকড়া থাকে। তাই ওটাকে বটতলা থেকে তুলে মাকুর চাবিকাঠি বানিয়েছি।'

ফিক করে সোনা হেসে ফেলল; ফিক করে ঘড়িওলা, জাদুকর, অধিকারী হেসে ফেলল;

সংও মুচ্ছো ভেঙে ফিক করে হাসল, তাই দেখে টিয়া ফিক-ফিক করে হাসতে লাগল। আর উপস্থিত সকলে পেটে হাত দিয়ে হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

হাসতে হাসতে যখন আর হাসা যায় না, তখন টিয়া ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল, ‘আমাদের খাবার সময় হয়ে গেছে, বড্ড খিদে পেয়েছে, মামনি বাপি ঠামু আম্মাকে চাই।’

সোনাও ম্যাও ধরল, ‘আমারও বড্ড খিদে পেয়েছে, আমিও ওদের চাই!’

এ কী সর্বনাশ! সবারই যে খিদে পেয়েছে, অথচ বটতলার রান্নাবান্না আধখ্যাঁচড়া হয়ে পড়ে আছে, উনুন-টুনুন নিবে একাকার! তখুনি সবাই উঠে দৌড়, দৌড়, মালিকের কোলে টিয়া, জাদুকরের কোলে সোনা আর

সবার আগে ঘড়িওলার হাত ধরে মাকু অন্ধকার বনবাদাড় ভেঙে পাঁই-পাঁই ছুটতে লাগল।

বনের মধ্যে তারার আলোয় সবাই মিলে ছুটতে ছুটতে যখন বটতলার কাছাকাছি পৌঁছেছে, অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, কোথায় অন্ধকার, বটতলা আলোয় আলো। কত লোক জমেছে, ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে, গনগন করে তিনটে উনুন জ্বলছে আর চারিদিকে যে সুগন্ধ ভুরভুর করছে, তার একটুখানি নাকে ঢুকেছে কি অমনি সব দুঃখ ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে!

টিয়া হঠাৎ খচমচ করে মালিকের কোল থেকে নেমে পড়ে, দু-হাত তুলে 'মা-মা-মা' বলে এলোপাথাড়ি দৌড়োতে লাগল।

সোনাও দু-হাতে ঠোঁট চেপে জাদুকরের কোল থেকে নেমে, অন্ধের মতো এগাছে ওগাছে ধাক্কা খেতে খেতে ছুটল। কী? হলো কী? এমন সময় বটতলার ভিড়ের মধ্যে গোলাপি শাড়ি পরা একজন সুন্দর মানুষ খুন্তি নামিয়ে, দৌড়ে এসে দু-হাত বাড়িয়ে, দু-জনাকে বুকে চেপে ধরলেন। মামনি, মামনি, মামনি। এক-গোছা মাটির থালা মাটিতে নামিয়ে মোটাসোটা লম্বা যে লোকটি হাসি হাসি মুখ করে কাছে এলেন, সেই যে বাপি তা আর কাউকে বলে দিতে হলো না।

তখন কী আদর, কী হাসি, কী গল্প, সে আর মুখে বলা যায় না। তারই মধ্যে ঝুপ করে পানের চুপড়ি নামিয়ে হাঁউমাউ করে ছুটে আম্মা এসে হাজির, ওদের দেখে তার পায়ের

গুপো এক্কেবারে সেরে গেছে। সবাই মিলে জড়াজড়ি করে তখন সে কী হট্টগোল, বাড়ি থেকে পালানোর জন্যে সোনা-টিয়াকে কেউ বকল না। খালি ঠামু হঠাৎ গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে বসেই সরু গলায় চেঁচিয়ে বললেন, 'ওরে, আমাকে কেউ নামিয়ে দিচ্ছে না কেন রে, দুষ্টু মেয়েদুটোকে আমি কি আদর করতে পাব না!'

সোনা-টিয়া খালি বলে, 'ও মামনি, ও বাপি, কী করে জানলে আমরা এখানে পালিয়ে এসেছি?' আম্মা চ্যাঁচাতে লাগল, 'তা আর জানবে না? তোদের পিসে কি মিছিমিছি পুলিশসাহেব হয়েছে? তোমরা পালাবার পরেই তো তার লোকেরা খবর দিল। বলিহারি তোমাদের সাহস বাপু! যে-বনে সার্কাস

পার্টির দুষ্টু অধিকারী দলবল নিয়ে গা ঢাকা দেয়, সেই বনে খালি হাতে ঢুকতে সাহস করো? ভাগ্যিস পিসে দেখতে পেয়েছিল, নইলে বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে যেত, সে-কথা কি একবার ভাবলে?'

টিয়া চোখ মুছে শুধু বললে, 'মোটেই খালি হাতে নয়, পুঁটলিতে জিনিস ছিল।' এতক্ষণে সোনা-টিয়ার খেয়াল হলো বটতলায় অনেক পুলিশ পেয়াদা। তারা অবিশ্যি ভজহরি আর বেহারিকে রান্নাবান্না আর খাবার জায়গা করতে সাহায্য করছে,তবু তাদের দেখে সার্কাসের লোকেরা ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে খাকি পোশাক পরা একজন লোক বেরিয়ে

এল। তার দু-হাতে ও দুটো কী? ওই-না দুটো বড়ো বড়ো প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল!!

সোনা-টিয়া হঠাৎ 'ও মাকু, ও মাকু—' বলে তার গায়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। এই তো তাদের আসল মাকু, আগের মাকু, আদরের মাকু, নিজেদের মাকু, সে যে সত্যি করে ওদের জন্য প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল এনেছে। 'মাকু মাকু মাকু' বলে তখন তাকে কী আদর। মামনি তো অবাক।—'মাকু কী রে? উনিই তো তোদের পিসেমশাই। উনিই তোদের খুঁজে দিয়েছেন, বাপির সঙ্গে গাছতলায় পিকনিকের ব্যবস্থা করেছেন।'

সোনা-টিয়া অবাক, 'ওমা, মামনি, কী বলে, এটা না মালিকের জন্মদিনের ভোজ, পিকনিক আবার কোথায়?'

মামনি বললেন, ‘ওই একই কথা, ভোজ না আরও কিছু! এসে দেখি খাবার জিনিস মাটিতে গড়াগড়ি, কে-বা রাঁধে, কে-বা খায়! তখন সবাই মিলে লেগে গেলাম। আজ বুঝি মালিকের জন্মদিন? কোথায় সে?’

পিসেমশাই বললেন, ‘হ্যাঁ, তাই তো! ও মালিক, তুমি কোথায় গেলে?’

হাত জোড় করে, ভয়ে ভয়ে মালিক এসে পিসেমশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। পিসেমশাই বললেন ‘কী এত ভয় কীসের? শুনেছি ধার-দেনা সব শোধ করে দেবে, তাহলে আবার ভাবনা কীসের? আমার পুলিশরা তা হলে খেয়ে-দেয়েই বাড়ি যাক, কী বলো? তোমরা কাল থানায় গিয়ে টাকা

জমা দিয়ে, ব্যবস্থা করে এসো, কেমন? আর সোনা-টিয়া, বোম্বাকে আদর করবে না?

আরে, ওই যে পিসির কোলে বোম্বা। পিসি বললেন, 'বোম্বা, ওই দ্যাখ্ দিদিরা।' বোম্বা বলল, 'জিজিয়া।' বলে খুশি হয়ে ওর হাতের সব কটা আঙুল একসঙ্গে মুখে পুরে দিল।

পিসেমশাই বললেন, 'উঃ, বড্ড খিদে পেয়েছে, এসো, আমরা খাই।'

বোম্বা আরও খুশি হয়ে বলল, 'কাই।'

তখন আর তাকে আদর না করে সোনা-টিয়া করে কী? এদিকে সার্কাসের লোকরা আহ্লাদে আটখানা, ভোজবাজির মতো তাদের সব ভাবনাচিন্তা দূর হয়ে গেছে। ঘড়িওলাকে পায় কে, মাকুকে যে কেউ কাঁদাতে পারবে এ তার আশার বাইরে ছিল।

এখন যখন খুশি মাকুর চাঁদি খুলে জ্যামের টিনে জল ঢাললেই, হাপুস নয়নে কান্না! এত আনন্দ ভাবা যায় না। সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করে বসে খেতে লাগল। মামনি বললেন, 'সারাদিন ওরা খেটেছে-খুটেছে, ওরা খেতে বসুক, আমরা পরিবেশন করি।' বাজনাদাররা মিছিমিছি দেরি করে ফেলাতে, প্রথমে দলে জায়গা পেল না। তাই তারা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে পিঁ-ই-ই ভোঁপর-ভোঁপর ভোঁ ধরল। খাবারগুলো দ্বিগুণ মিষ্টি হয়ে উঠল।

বাপি স্বর্গের সুরুয়া খেয়ে মুগ্ধ। 'আহা এমনটি তো জন্মে খাইনি। কে রাঁধল?'

মালিক লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল, কে রেঁধেছে কারো বুঝতে বাকি রইল না। মামনি

আর পিসি বললেন, 'ও মালিক, শিখিয়ে দাও, শিখিয়ে দাও।'

টিয়া তো অবাক, 'ও তোমরা পারবে না, দাড়ি-গোঁফ দিয়ে করতে হয়।'

সার্কাস পার্টির লোকদের কান খাড়া হয়ে উঠল। 'দাড়ি-গোঁফ দিয়ে করতে হয় আবার কী? ও মালিক, ব্যাপার কী?'

সোনা তখন টিয়ার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, 'না, না, কিছু না, আজ সকালে মালিকের দাড়ি-গোঁফ হাঁড়িতে পড়েছিল কি না—'

সার্কাসের লোকেরা খুশি হয়ে বলল, 'তা দাড়ি-গোঁফই হোক আর পরচুলাই হোক, স্বর্গের সুরুয়ার মতো কেউ রাঁধুক দেখি!

অবিশ্যি নোটোমাস্টারকে আর রাঁধতে দেওয়া হবে না; ও বলে দেবে, আমরা রাঁধব।'

মালিক তখন পিসেমশাইয়ের কাছে এসে বলল, 'আমার শত অপরাধ মাপ করবেন, স্যার, চাকর ভেবে না জেনে কত মন্দ কথা বলেছি।'

—'আরে ছো ছো, পুলিশের লোকদের অমন মন্দ কথা সবাই বলে। তা ছাড়া আমাকে তো বলোনি, বেহারিকে বলেছ।'

বেহারি তাই শুনে বলল, 'আজ্ঞে।'

টিয়া এতক্ষণে সুবিধে পেয়ে পিসেমশাইকে কানে কানে বলল, 'তবে কি তুমি মাকু নও? ওই লোকটা মাকু?'

সোনা বলল, 'তুমি কি আমাদের খুঁজতে বনে এসেছিলে?'

পিসেমশাই হেসে ফেললেন। 'আসলে আমি নোটোমাস্টারকে আর ঘড়িওলাকে ধরতে এসেছিলাম। বনের মধ্যে ওরা গা ঢাকা দিয়েছে, সে খবর আগেই পেয়েছিলাম। তোমাদের বাড়ি পৌঁছেই শুনি তোমরা বনে পালিয়েছ। তখন বাপি আর আমি বনে গিয়ে দেখি তোমরা নদীর ধারে ঘুমোচ্ছ! বাপিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের কাছে রইলাম। প্রথমে তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না, আমাকে কেন মাকু মাকু বলছ।'

সোনা বলল, 'তুমি মাকু নও, তবে তোমার লালচে কোঁকড়া চুল আর নাকের ওপর তিল কেন?'

পিসেমশাই বললেন, 'ভাগ্যিস আমার ওইসব ছিল, তাই তো মাকু ভেবে আমার কত যত্ন করলে তোমরা।'

পোস্টাপিসের পিওন বললে, 'তো তোমায় যত্ন-আত্তি করে থাকতে পারে পুলিশসাহেব, আমাকে কিন্তু বাঘের গর্তে ফেলেছিল।'

সোনা বললে, 'আমরা যে তোমাকেই পেয়াদা ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি উঠলে কী করে?

—'ওমা, তাও জান না? ধপাস্ করে পড়লাম তিনটে সত্যিকার পেয়াদার উপরে, বাপরে কী তাদের চেল্লানি! ভাগ্যিস ওইখানে ওরা লুকোনো ঘাঁটি করেছিল, তাই রক্ষে। আমাকে অনেক জেরা করে, শেষটা ওরাই ঠেলেঠুলে তুলে দিল। তবেই-না সঙের লটারি জেতবার খবর পৌঁছে দিতে পারলাম!'

টিয়া বললে, 'তুমি বড়ো ভালো।'

টিয়ার পাশে জাদুকর; পায়েসের বাটির তলা চেটে সে বললে, 'ওই যাঃ! তোমাদের খরগোশছানা নিয়ে যাবে না?' এই বলে পিসেমশাইয়ের বুকপকেট থেকে গলায় রেশমি ফিতে বাধাঁ খরগোশদুটোকে বের করে সোনা-টিয়ার হাতে দিল। মামনি, পিসি, ঠামু আর আম্মা এমনি চমকে গেল যে ঠামু ডাল থেকে পড়েই গেলেন।

অনেক রাত হয়েছে, বোম্বা ঘুমিয়েই পড়েছে, সোনা-টিয়ার চোখও ঘুমে জড়িয়ে এসেছে। পিসেমশাই বললেন, 'আমার জিপে করে এবার তাহলে ঠামু, আম্মা, বোম্বা আর সোনা-টিয়া বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক।'

অমনি সোনা-টিয়া ঢুলুঢুলু চোখে মহা আপত্তি করতে লাগল, 'না, না, না, আমরা

পরিদের রানিকে দেখব।' মালিক বললে, 'দেখবে বই কি, রোজ সার্কাস হবে, রোজ মাকুর সঙ্গে পরিদের রানির বিয়ে হবে, রোজ তোমাদের বাড়ির সকলকে পাস দেওয়া হবে। এখন বাড়ি যাও কেমন?'

সোনা বলল, 'পরিদের রানিকে তোমার জন্মদিনের ভোজে নেমন্তন্ন করোনি কেন?'

দড়াবাজির সব থেকে ছোট্ট ছোকরা বললে, 'বাঃ, তোমাদের যা বুদ্ধি! পরিরা আবার মধু ছাড়া কিছু খায় নাকি যে ভুনিখিচুড়ি আর হরিণের মাংস খেতে বলা হবে? তাছাড়া—' এই বলে ছোকরা ফিক করে হাসল!

ততক্ষণে জিপ এসে গেছে, ঠামুরা উঠেছেন, সোনা-টিয়াকেও এক রকম জোরজার করে তুলে দেওয়া হলো।

টিয়া কিছুতেই ছাড়ে না, ‘না, না, বলো সে কোথায় গেল? তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?’

ছোকরা বলল, ‘দূর বোকা, তাকে দেখতে পাচ্ছ বই কী! আরে আমিই যে পরিদের রানি সাজি, তাও জান না—’

সোনা-টিয়া আম্মার গায়ে ঠেস দিয়ে হাই তুলে বলল, ‘প্যাঁ-প্যাঁদের আমাদের কোলে দাও, বাড়ি চলো, ঘুম পেয়েছে।’

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (শব্দসংখ্যা ১০-২৫) (পূর্ণমান ২)

১. আম্মা কে ছিলেন?

২. সং কে? সে বনের মধ্যে কী করছিল?

৩. ঘড়িওলার দাদা কে?

৪. সোনা-টিয়া যাকে পেয়াদা ভেবেছিল সে আসলে কে?

৫. যে চাবি দিয়ে টিয়া মাকুকে চালু করেছিল সেটা আসলে কী ছিল?

৬. জাদুকর সোনা-টিয়াকে কী দিয়েছিল?

৭. পিসেমশাই কী চাকরি করতেন?

৮. ‘স্বর্গের সুরুয়া’ কেমনভাবে রান্না করা হতো?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (শব্দসংখ্যা ৫০-১০০) (পূর্ণমান ৩)

১. কালিয়ার বন কোথায়? সেখানে কীভাবে যেতে হয়?

২. ঘড়িওলার হ্যান্ডবিলে কী লেখা ছিল সংক্ষেপে লেখো।

৩. মাকুর চাবি কতদিনের জন্য ঘড়িওলা দিয়েছিল? তারপর কী হবার কথা?

৪. হোটেলওলাকে কেমন দেখতে? সে সোনা-টিয়াকে কীভাবে সাহায্য করেছিল?

৫. সং কেন সপ্তাহে তিনবার পোষ্টাপিশে যেত?

৬. সং-এর লটারির টিকিটের আধখানা হোটেলওলা কীভাবে হারিয়েছিল?

৭. ‘বাঘধরার বড়ো ফাঁদ’- কীরকম দেখতে?

৮. হোটেলওলা আসলে কে?

৯. মাকুকে কে দম দিয়ে আবার চালু করল? কীভাবে?

১০. সং-এর লটারির টিকিটের আধখানা কীভাবে খুঁজে পাওয়া গেল?

নিজের ভাষায় উত্তর দাও (শব্দসংখ্যা ৭৫-২০০) (পূর্ণমান ৫)

১. মাকু কে? সে কেন ঘড়িওলাকে খুঁজছিল?

২. নদীতে জানোয়ারদের চান করার যে দৃশ্য সোনা-টিয়া দেখেছিল তা নিজের ভাষায় লেখো।

৩. 'হোটেল বলে হোটেল! সে এক এলাহি ব্যাপার!' -বনের মধ্যে এই হোটেল কে চালাত? তার
কীর্তকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪. সার্কাসের লোকেরা বনের মধ্যে কেন ছিল? হোটেলওলা সোনা-টিয়াকে কী ব্যাখ্যা দিয়েছিল?

৫. ঘড়িওলা বনের মধ্যে লুকিয়ে বেড়াত কেন?

৬. বনের মধ্যে সোনা-টিয়া কী কী জন্তুজানোয়ার দেখেছিল নিজের ভাষায় লেখো।

৭. হোটেলওলার জন্মদিনের উৎসব কেমন হয়েছিল লেখো।

৮. কেমন করে বোঝা গেল যে হোটেলওলাই নোটো অধিকারী?

৯. সোনা-টিয়া কীভাবে তাদের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে ঘরে ফিরতে পারল?

১০. মাকু কীভাবে কাঁদতে পারল?

১১. 'মাকু' পড়ে তোমার কেমন লাগল সেটা সংক্ষেপে লেখো। কোন চরিত্রকে সব

থেকে ভালো লাগলো সেকথাও লেখো।

১২. 'মাকু' বইয়ের নাম কি 'সোনা-টিয়ার অ্যাডভেঞ্চার' হলে বেশি ভালো হতো? তোমার কী মনে হয়? এ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।